শাহ ওয়ালীউল্লাহ আশআরির আকীদা বনাম সালাফি আকীদা

লিখেছেন মাওলানা Ayeatullah Ali Ahnaf হাফি

শাহ ওয়ালীউল্লাহ আশআরির আকীদা বনাম সালাফি আকীদা—১ম পর্ব।

আবূ বকর জাকারিয়া দেহবাদীর আকীদাগত ভ্রান্তি নিয়ে দেখলাম সালাফিরাও কলম ধরেছেন,সালাফিদের ভিতর আকীদাগত মতানৈক্য নতুন নয়,এটা একদম প্রাচীন বিষয়।ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মন্তব্য একটি তার ছাত্রদের মন্তব্য আরেকটি,এমনিভাবে আহমদ বিন হাম্বলের মন্তব্য একদিকে তার গোমরাহি অনুসারীদের মন্তব্য অন্যদিকে। তামিমি বলেন একদিকে ইমাম কুদামা বলেন আরেক দিকে।আবূ ইয়ালা বলেন একটি,ইবনে তাইমিয়া বলেন অন্যটি।তারপরও ইবনে তাইমিয়া ছাড়া বাকিদের আকীদা আহলুস সুন্নাহর আশআরি আকীদার মতোই,কিছুটা ব্যাতিক্রমের সাথে।ইমাম ইবনে তাইমিয়াও আহলে সুন্নাহর আকীদা বিশ্লেষণ করেছেন, তবে সালাফ খালাপ বাদ দিয়ে নিজের মতো করে। তার একদল অনুসারীর কট্টরতা না থাকলে আকিদা বাদ দিয়ে বিভিন্ন মাসআলায়, আহলুস

সুন্নাহর নিকটে তিনি একজন সম্মানিত ব্যাক্তি হতে পারতেন।

মুল আলোচনায় আসি, ইমাম ওয়ালীউল্লাহ একজন পাক্কা, সূফি আশআরি হানাফি ছিলেন, দেহবাদী জাকারিয়া বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাকে সালাফি বানানোর অপচেষ্টা চালিয়েছেন, আমরা তার জবাব লিখবো দুই পর্বে, প্রথম পর্বে আলোচনা করছি, তিনি একজন পাক্কা আশআরি সূফি, তার আকীদায় কোন পরিবর্তন হয়নি –

–জাকারিয়া দেহবাদী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.)–এর আকীদাহ ও চিন্তাধারাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্য গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে একাধিক ঐতিহাসিক ও বৌদ্ধিক জালিয়াতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা এখানে সংক্ষেপে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে সেই জালিয়াতিগুলো তুলে ধরছি।প্রথম জালিয়াতি: ইলমুল কালামকে “মহামারী” আখ্যা দেওয়া–
–জাকারিয়া লিখেছেন– আকীদাহ বলতে তখন ইলমুল কালাম নামক মহামারীর ব্যাপক সয়লাব।এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ইলমুল কালাম একটি বিকৃত, ক্ষতিকর ও পরিত্যাজ্য বিদ্যা। অথচ বাস্তবতা হলো–ইলমুল কালাম একটি মর্যাদাপূর্ণ ইসলামি শাস্ত্র, যা কুরআন–সুন্নাহ

ও যুক্তির আলোকে ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করে।ইমাম আবু হাসান আশ'আরী, ইমাম মাতুরিদী, ইমাম বাকিল্লানী, ইমাম জুয়াইনী, ইমাম গাজ্জালী (রহ.)—এঁরা সকলেই এই বিদ্যার মাধ্যমে উম্মাহর আকীদা সংরক্ষণ করেছেন।শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) নিজেও যুক্তি, দর্শন ও কালাম বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন এবং তা পরিহার করেছেন—এমন দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।অতএব, ইলমুল কালামকে "মহামারী" বলা মূলত আহলুস সুন্নাহর বহু ইমামের উপর পরোক্ষ আক্রমণের নামান্তর।–

–দ্বিতীয় জালিয়াতি: সূফীবাদকে নিকৃষ্ট ও ভ্রান্ত প্রমাণের অপচেষ্টা, জাকারিয়া লিখেছেন—"তখনকার ভারতবর্ষ সূফীবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল।"এর মাধ্যমে তিনি সূফীবাদকে একটি নিকৃষ্ট ও বিভ্রান্ত প্রবাহ হিসেবে চিত্রিত করতে চান। অথচ—সূফীবাদ হলো ইহসানের শাস্ত্র,যা কুরআন ও সুন্নাহর আত্মিক ব্যাখ্যা।
ইমাম জুনাইদ বাগদাদী, আবদুল কাদের জিলানী, ইমাম গাজ্জালী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)—এঁরা সবাই সূফি ছিলেন।আহলুস সুন্নাহর ইতিহাসে সূফীবাদ কখনোই আকীদার বিরুদ্ধে ছিল না; বরং নফসের তাযকিয়া ও আল্লাহর মারেফতের পথ।অতএব, সূফীবাদকে নিকৃষ্ট বলা মানে ইসলামের একটি স্বীকৃত ধারাকে অস্বীকার করা।–

–তৃতীয় জালিয়াতি: শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.)–এর “আকীদাহ পরিবর্তন”জাকারিয়ার মূল দাবি হলো–
শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) প্রথম জীবনে ভ্রান্ত আকীদায় ছিলেন,পরে শায়েখ আবু তাহের কুর্দীর কাছে গিয়ে সূফীবাদ ত্যাগ করে সহীহ আকীদা গ্রহণ করেন।এই দাবি ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ মিথ্যা। যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।–

–চতুর্থ জালিয়াতি: শায়খ আবু তাহের কুর্দীর পরিচয় বিকৃতি,জাকারিয়া, যাঁর মাধ্যমে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) “সহীহ আকীদা” শিখেছেন বলে দাবি করেন, সেই–শায়খ আবু তাহের কুর্দী মাদানী (রহ.) সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্য হলো–তিনি ছিলেন আশ‘আরী আকীদার অনুসারী,তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ সূফি ও সালিক,তিনি জাহিরি ও বাতিনি উভয় ইলমের জামে‘ ছিলেন,তিনি নিয়মিত খতমে বুখারীর মজলিস আয়োজন করতেন (যা সালাফিদের দৃষ্টিতে বিদ‘আত!)শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) নিজেই তার শায়েখ কুরদির যে পরিচয় দিয়েছেন তা জাকারিয়া দেহবাদীর বক্তব্যের বিপরীত,শাহ সাহেব নিজ ব্যাক্তিগত জীবনীতে লিখেছেন–
شیخ أبو طاهر کا خرقه جامعه پهنا جو تمام خرقه صوفیه پر

حاوي كها جا سكتا هيں

অর্থাৎ:শায়খ আবু তাহেরের খিরকা এতটাই ব্যাপক ও পরিপূর্ণ ছিল যে, তার মধ্যে সমস্ত সূফি তরিকার খিরকাই অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।জুজউল লতীফ,পৃ.২

আর শাহ সাহেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ আল-কওলুল জলী-তে লেখা আছে—

شيخ ابو طاهر كردي مدني مروي معمر جامع علوم ظاهري و باطني متصوف تفقه محدث بودند

আবূ তাহের কুরদী ছিলেন একজন প্রবীণ আলেম, জাহিরি ও বাতিনি উভয় জ্ঞানের অধিকারী, একজন সূফি এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস।

এর একটু পর, আশিক ফুলতি লিখেছেন,শায়েখ আবূ তাহের কুরদি বুখারী শরীফের খতমের দিনে একটি বিশেষ মজলিসের আয়োজন করেছিলেন। তিনি খাবারের দাওয়াতের ব্যবস্থাও করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছিল, আল কওলুল জলি ফি আসারিল ওয়ালী,পৃ.৪৫

আল কওলুল জলির লিখকের পরিচয় হলো— সালাফি দেহবাদীদের একজনে লিখেছেন,

ابن خاله الشيخ الصالح الشاه محمد عاشق الفلتي ابن الشيخ عبيد الله الفاروقي (الذي هو خال الشاه ولى الله الدهلوى) . لزم الامام الشاه ولى الله الدهلوى زمانا طويلا و صحبه صحبة حسنة . وكان يلازمه في السفر و الحضر وكان معه في رحلته الحجازية . فاستفاد منه العلوم وحمل عنه الفيوض . تخرج عليه فكان وارث علومه . ثم نشرها و درسها بعده فتلقى منه خلق كثير في مقدمتهم الشيخ العلامة الشاه عبد العزيز الدهلوي والشيخ الفاضل الشاه رفيع الدين ابنا الشاه ولى الله الدهلوى الذان تلقيا منه ما فاتهما من علوم والدهما وفيوضه.

তিনি ছিলেন শাহ সাহেবের মামাতো ভাই নেককার আলেম শায়েখ শাহ মুহাম্মদ আশিক ফুলতি, যিনি শায়েখ উবাইদুল্লাহ ফারুকী–এর পুত্র। (আর শাইখ উবাইদুল্লাহ ফারুকী ছিলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী–এর মামা)।শাহ মুহাম্মদ আশিক ফুলতি দীর্ঘ সময় ধরে ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী–এর সান্নিধ্যে ছিলেন এবং খুব ভালোভাবে তাঁর সাহচর্য লাভ করেন। সফর ও অবস্থান–সব সময়েই তিনি তাঁর সঙ্গে থাকতেন। এমনকি শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর হিজাজ সফরেও তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন।এই দীর্ঘ সাহচর্যের ফলে তিনি তাঁর কাছ থেকে নানা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন এবং আধ্যাত্মিক বরকত ও ফয়েজ লাভ করেন। তিনি মূলত তাঁর হাতেই

শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং তাঁর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হন।পরবর্তীতে তিনি সেই জ্ঞান প্রচার করেন ও শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে বহু মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন—শায়খুল আল্লামা শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী এবং শায়েখ শাহ রফীউদ্দিন দেহলভী—যাঁরা ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর পুত্র।এই দুইজন তাঁর কাছ থেকে তাঁদের পিতার যেসব জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ফয়েজ থেকে বঞ্চিত ছিলেন,সেগুলো পূর্ণতা সহকারে অর্জন করেন।হায়াতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ, পৃ.৫১

মোটকথা, হিজাজ সফরে যা কিছু ঘটেছিল—সবকিছুই শাহ মুহাম্মদ আশিক ফুলতি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হিসেবে সফর ও অবস্থান—সব পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি শাহ সাহেবের জীবদ্দশাতেই হিজাজ সফরের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেন।ফুলতিই স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে আবূ তাহের কুরদী ছিলেন একজন প্রকৃত সূফি, যিনি জাহেরি ও বাতেনি—উভয় প্রকার ইলমের সমন্বয়কারী ছিলেন। এর বিপরীতে জাকারিয়া দেহবাদী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচার করেছেন। তিনি ভিত্তিহীনভাবে দাবি করেছেন যে শাহ ওলি উল্লাহ দেহলভী নাকি আবূ

তাহের কুরদীর কাছে গিয়ে সূফিবাদ ও তার দৃষ্টিতে অন্যান্য ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন—যার কোনো ঐতিহাসিক বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।অতএব,প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘনিষ্ঠ সাহাবি হিসেবে ফুলতির বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য; আর জাকারিয়া দেহবাদীর বক্তব্য ইতিহাস ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হওয়ার কারণে বর্জনীয়।–

#আবূ তাহের কুরদী একজন সূফি হওয়ার পাশাপাশি একজন আশআরি ইমাম ছিলেন, শাহ সাহেব তার এক চিঠিতে বিষয়টি স্পষ্ট করে লিখেছেন,সেই চিঠির আরবি অনুবাদ করেছে এক সালাফি, সেখানে শাহ সাহেব লিখেছেন,

قدل على أنهم اتفقوا على الايمان بها على الوجه الذي أراده الله تعالى منها . و أوجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله " ليس كمثله شي". فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم، فقد خالف سبيلهم. انتهى ،

এগুলো প্রমাণ করে যে, তারা সবাই এসব বিষয়ের প্রতি সেইভাবেই ঈমান এনেছেন, যেভাবে আল্লাহ তাআলা নিজে তা উদ্দেশ্য করেছেন।আর তারা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য থেকে পবিত্র ঘোষণা করা অপরিহার্য করেছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে—তার মতো কিছুই নেই’ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)।অতএব, তাদের পর যারা এর বিপরীত মত গ্রহণ

করেছে, সে তাদের পথের বিরোধিতা করেছে।এই বক্তব্যটি হুজ্জাতুল্লাহর মধ্যেও রয়েছে।

#এটাই মূলত তাফউইজুল মা'না। কারণ আশআরী আলেমদের নীতিই হলো—আল্লাহ তাআলার সিফাত-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের নির্দিষ্ট অর্থ ও প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার নিকট সোপর্দ করা, অর্থাৎ কোন অর্থটি আল্লাহর জন্য উদ্দেশ্য—তা নির্ধারণে তারা প্রবেশ করেন না।এখানে শাহ সাহেব স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—

أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله تعالى منها

তারা সবাই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, এসবের প্রতি ঈমান আনা হবে ঠিক সেই পদ্ধতিতে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা নিজে তা উদ্দেশ্য করেছেন।"আর আল্লাহর উদ্দেশ্য আমাদের জানা নেই।

এই বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে,

সিফাত-সংক্রান্ত নুসূসের মা'না নির্ধারণ করা হয়নি, বরং তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।এটাই হলো প্রকৃত তাফউইজুল মা'না—যেখানে ঈমান রাখা হয়, কিন্তু অর্থ নির্ধারণে প্রবেশ করা হয় না, এবং একই সঙ্গে আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র মনে করা হয়—যেমনটি কুরআনের এই আয়াত দ্বারা

প্রমাণিত:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

“তার মতো কিছুই নেই।”অতএব, শাহ সাহেবের এই বক্তব্য আশআরী আকীদার সেই মৌলিক নীতিকেই প্রতিষ্ঠা করে—তা হলো, ঈমান সাব্যস্ত করা, তাশবীহ নাকচ করা এবং অর্থ নির্ধারণ আল্লাহর উদ্দেশ্যের ওপর তাফউইজ করা।

এরপর তিনি পরিষ্কার করে জানান যে,এই আকীদাটিই ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.)–এর মাযহাব,যা আবূ তাহের কুরদী তার পিতার লেখা থেকে তাকে পড়িয়েছেন, তিনি লিখেছেন,

أقرأني أبو طاهر المدني رضي الله عنه بخط أبيه أن الشيخ أبا الحسن قال في كتابه: إني على مذهب أحمد في مسألة الصفات ، وأن الله فوق العرش

আর যা আমার প্রমাণ করেছি এটিই আবুল হাসান আশআরির মাজহাব,আবূ তাহের মাদানী (রহ.) আমাকে তাঁর পিতার হাতের লেখায় পাঠ করে শুনিয়েছেন যে, শাইখ আবুল হাসান আশআর তাঁর কিতাবে বলেছেন:‘আমি সিফাতের বিষয়ে ইমাম আহমদের মাযহাবের ওপর আছি, এবং আল্লাহ আরশের ওপর।হায়াতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ,পৃ.৬৬

এখানে ইমাম আশআরী নিজেকে সিফাতের বিষয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)–এর অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন।ইমাম আহমদের মাযহাব হলো–বিলা-কাইফ ঈমান, তাশবীহ পরিহার, এবং মা'না আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা।সুতরাং "আল্লাহ আরশের ওপর"–এই বক্তব্যও, কোনো দিক, স্থান বা শারীরিক অবস্থান বোঝানোর জন্য নয়;বরং এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন।এটাই হলো আশআরিদের তাফউইজুল মা'না।(শাহ সাহেবের বক্তব্যের আলোকে পরবর্তীতে এটিকে আরো জোরালো বিশ্লেষণ করা হবে।)

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে ইমাম আবূ তাহের কুরদী নিজের আকীদার সনদ ইমাম আশআরির দিকে সম্পর্কিত করেছেন, আর শাহ সাহেবো সেটি নিজের আকীদা হিসেবে বর্ণনা করতেছেন। যা প্রমাণ করে দুজনই আশআরি আকীদার ওপর রয়েছেন।শুধু তাই নয়, আশআরি নিসবতের ওপর ইমাম আবূ তাহের কুরদী হাদীসে মুসালসালো বর্ণনা করেছেন, এবং সেটি শাহ সাহেব নিজের মুসালসাল সনদে উল্লেখ করেছেন,হাদীসটির প্রথম অংশে শাহ সাহেব যা লিখেছেন তা নিম্নরূপ,

قال الفقير ولي الله عفي عنه - ومختاره في العقيدة مذهب المتقدمين من الأشاعرة - عن أبي طاهر الشافعي الأشعري أبيه

الشيخ إبراهيم الكردي الأشعري

ফকির ওয়ালীউল্লাহ বলেন, তার নির্বাচিত আকীদা হলো মুতাকাদ্দিমীন আশাআরীদের আকীদা – তিনি বর্ণনা করেছেন আবু তাহের শাফিই আশআরি থেকে, তিনি তার পিতা শায়েখ ইব্রাহিম কুর্দি আশআরি থেকে।
মুসালসাল বর্ণনা, ১১–

#যিনি নিজে আশাআরি, তাঁর শায়েখ আশাআরি, তাঁর পিতাও আশাআরি, আর পিতার উস্তাদও আশাআরি ছিলেন – সে কিভাবে আশাআরি নয়? অথচ তিনি নিজেই নিজেকে আশাআরি আকীদার দিকেই নিসবত করেছেন।এ অবস্থায়ও কি এখনও জাকারিয়ার ধোঁকাবাজি নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

শুধু তাই নয় শাহ ওয়ালীউল্লাহ হিজাজে গিয়ে, আশআরির আকীদার বিভিন্ন কঠিন মাসআলা বিশ্লেষণো করেছেন তার সফরসঙ্গী আশিক ফুলতি আল কওলুল জলিতে লিখেছেন, শাহ সাহেব বলেছেন
অনেক মানুষ দাবি করে যে তারা খুব বড় আলেম, সব জটিল সমস্যার সমাধান জানে। কিন্তু বাস্তবে কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় আছে, যেগুলো এখনো পর্যন্ত কেউ

পরিষ্কার ও ঠিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেনি। বরং অনেক সময় মানুষ বিষয় না বুঝেই অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে।যেমন তাজাদ্দুদে আমসাল নামের একটি জটিল বিষয় আছে। এ বিষয়ে আশআরিরা বলেন—এটা আরজ এর সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু জওহারএর অংশ নয়। তাহলে এর প্রকৃত বিশ্লেষণ কী? আর এই বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার কারণই বা কী?এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আকদাস খুব সুন্দর ও প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা দেন। তাঁর কথা এত সুন্দর ও গভীর ছিল যে সেখানে উপস্থিত আরব আলেমরাও অবাক হয়ে যান।আল কওলুল জলি ফি আসারি ওয়ালী পৃ.১৫২

তিনি আশআরিদের কালামে নফসির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেটাকে সালাফিরা চুড়ান্ত গোমরাহি মনে করে,—তিনি আল খায়রুল কাসীর এবং হুজ্জাতুল্লাহর মধ্যে সেটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখেছেন।

উস্তাদ আশআরি, নিজে ছিলেন মাতুরিদি শায়খের সন্তান, তিনিতো এগুলোই বিশ্লেষণ করবেন তাই নয়কি? তিনি তো ইবনে তাইমিয়ার আকীদাও লিখেছেন, তাকে পথভ্রষ্ট বলেন নি, তিনি চাইলেতো নিজেকে ইবনে তাইমিয়ার দিকে এবং হাম্বলী আসারী আকীদার দিকেও নিসবত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি এমনটি করেন নি, কারণ তার মধ্যে আশআরি

আকীদার মহব্বত ভালোবাসা গভীরভাবেই গেঁথে গিয়েছিল, তাই তো তিনি মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে ১১৫৯ হিজরিতে নিজ সাক্ষর দিয়ে তার ঘনিষ্ঠ এক ছাত্রের বুখারীর এজাজত নামার নিচে স্পষ্ট করে তিনি লিখে গিয়েছেন,

وَلِيُّ الله أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحِيمِ بْنِ وَجيهِ الدّين بْنِ مُعْظَمِ بْنِ مَنْصورٍ الحنفي عملا ً، الشافعي تدريساً، الأشعري معتقداً، و الدهلوي مولداً، والعمري نسباً، الصوفي على الطريقة النقشبندية

ওয়ালীউল্লাহ আহমদ ইবনে আব্দুল রহীম ইবনে ওজিহুদ্দিন ইবনে মু'জাম ইবনে মানসুর, হানাফী ফিকহ অনুযায়ী আমল করি,শিক্ষাদানে শাফিই,আশআরী আকীদার অনুসারী, দেহলভীর নাগরিক, উমরীর বংশের সন্তান, এবং নকশবন্দি তরিকার সুফি।

হারামাইনে যাওয়ার আগেও তিনি আশআরি আকীদা এবং আবুল হাসান আশআরির প্রশংসা করেছেন শুধু করেন নি হাম্বলি দেহবাদী আকীদার প্রশংসা, তিনি কতো চমৎকার করে লিখেছেন,

ولمذهب الشيخ ابى الحسن عندنا وقع ومذهبه من تماثيل مذهب الصحابة وهو من تحت الارادة المتجددة وهي ملاك عزماته ولهذا نظره ان يلغي كل تفصيل فاضل واذا دخلت في معرفة الصحابة تعين هذا المذهب بالتحقيق،

আমাদের কাছে শায়েখ আবুল-হাসানের মাযহাবের একটি গ্রহণযোগ্যতা আছে। তাঁর মাযহাব মূলত সাহাবায়ে কেরামের মাযহাবেরই অনুরূপ। এটি নব নব উদ্ভূত ইচ্ছার অধীনে রয়েছে, আর সেই ইচ্ছাই তাঁর দৃঢ় সংকল্পের মূল ভিত্তি।এই কারণেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হলো—অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত সব বিষয় পরিহার করা।আর যখন তুমি সাহাবাদের (পথ ও বাস্তব অবস্থাকে) গভীরভাবে অনুধাবন করবে,তখন গবেষণার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এই মাযহাবটিই সঠিক ও নির্ধারিত।
আল খায়রুল কাসীর,, পৃ.১২২

একই পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন,
واختلافهم في الايمان والاسلام والتصديق نزاع لفظ لا يرجع الى معنوى ومع هذا فالحق ما عليه الاشعرية لانه هو اصطلاح الصدر الأول
ঈমান, ইসলাম ও তাসদীক নিয়ে তাদের মধ্যে যে মতভেদ আছে, তা আসলে শব্দগত মতভেদ; এর পেছনে প্রকৃত অর্থগত কোনো বিরোধ নেই। তা সত্ত্বেও সঠিক মত হলো আশ'আরীদের মত, কারণ এটিই প্রথম যুগের (সালাফদের) পরিভাষা,আল খায়রুল কাসীর,, পৃ.১২২

#তিনি আবুল হাসান আশআরিকে আহলুস সুন্নাহর ইমাম

আখ্যা দিয়ে লিখেছেন –

وَمِمّنْ ذكره السُبْكِيّ فِي طبقاته الشّيْخ أَبَا الْحسن الْأَشْعَرِيّ إِمَام أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَقَالَ إِنّه مَعْدُود من الشّافِعِيّة

যাঁদের কথা ইমাম সুবকী তাঁর ‘তাবাকাত’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শাইখ আবুল-হাসান আল-আশ‘আরীও আছেন। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের ইমাম। আর তিনি বলেছেন, আবুল-হাসান আল-আশ‘আরী শাফেয়ি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত।আল ইনসাফ ফী বয়ানে আসবাবিল ইখতিলাফ,পৃ.৭৭

#তিনি তো একটি বারের জন্য ইবনে তাইমিয়া বা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে আহলুস সুন্নাহর ইমাম বলেননি একটি বারের জন্য নিজেকে হাম্বলি আসারীদের দিকে নিসবত করেননি, একটি বারের জন্য তিনি বলেননি আশআরিদের এই সমস্যা ঐ সমস্যা রয়েছে।

শুধু তাই নয়,তিনি যেভাবে জীবনের আখেরী বছরগুলোতে হানাফি মাজহাব এবং আশআরি আকীদা সূফি নকশবন্দি তরিকাকে ভুলেননি ঠিক তেমনিভাবে হিজাজ সফরে গিয়েও হানাফি মাজহাব এবং আশআরি আকীদাকে ভুলে যাননি,হারামাইনে আকীদার যে বিশ্লেষণ

তিনি করেছেন তা তো আগে উল্লেখ করেছি। তার বিশ্বস্ত হিজাজ সফরসঙ্গী ও মামাত ভাই আশিক ফুলতি লিখেছেন,

#পনেরোতম জিলক্বদে তিনি মক্কা মুয়াজ্জামার মধ্যে উপস্থিত হয়ে বড় বড় আলেম ও জ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তামাত্ত্যু উমরাহ সম্পন্ন করলেন। এরপর জিলহজ মাসে ফরজ হজ আদায় করলেন। মক্কায় অবস্থানকালে স্থানীয় সব বিশিষ্ট আলেম ও জ্ঞানী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলেন এবং বিভিন্ন ধরনের ইলমি ও ধর্মীয় প্রশ্ন করলেন। প্রতিটি প্রশ্নে তিনি দিলখোস উত্তর দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেন। তাঁর এই জ্ঞান ও দক্ষতা দেখে সবাই তাঁকে সর্বোচ্চ ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে মেনে নিল। এরপর মানুষ তাঁর কাছে নিয়মিত শিক্ষা ও দারস গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলো। তাই তিনি এই অনুরোধ মেনে মসজিদুল হারামের হানাফিদের নামাজ আদায় করার এলাকার কাছে দারস দেওয়া শুরু করলেন।সুবহানাল্লাহ সেখানেও তিনি হানাফিদের জায়গায় খুঁজে নিলেন!!আল কওলুল জলি,উর্দু,পৃ.১২৭

শাহ সাহেব দেশে ফিরে এসে হারামাইনে তার সাথে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গায়েবি তাসাউফি বিষয়গুলো লেখা শুরু করেন,সেগুলো দুটি বইয়ে লিখে শেষ করেন, তারমধ্যে

প্রথম বই হলো ফুয়ূজুল হারামাইন, সেখানে তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া নির্দেশগুলো লিপিবদ্ধ করে আমাদের তার ফিকহি এবং ইতিকাদী ও তাসাওউফি অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন,যা দেখা যায়, জাকারিয়া দেহবাদীর বক্তব্যের একদম উল্টো, তিনি ফুয়ূজুল হারামাইনের, ৬৩' পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

، واياك ان تخالف القوم في الفروع ، فإنه مناقضة المراد الحق ثم كشف انموذجا ظهر لي منه كيفية وتطبيق السنة بفقه الحنفية من الأخذ بقول أحد الثلاثة...

#আর ফিকহি বিষয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ করবে না, কারণ এটি ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যের বিপরীতে অবস্থান নেওয়ার মতো। এরপর রাসূল সা. এমন একটি উদাহরণ উদঘাটন করলেন,যার মাধ্যমে স্পষ্ট হলো কিভাবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী সুন্নাহ প্রয়োগ করা হয়,বিশেষত যখন তিন ইমামের মধ্যে একজনের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়।ফুয়ূজুল হারামাইন পৃ.৬৩

শাহ সাহেব রাসূলের আরেকটি নির্দেশনা বর্ণনা করে লিখেছেন,

عرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في المذهب الحنفي طريقة أنيقة هي أوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخاري وأصحابه

#রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জানিয়েছেন যে হানাফি মাযহাবে একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি রয়েছে, যা সুন্নাহর সাথে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি সেই সুন্নাহর পথ যা ইমাম বুখারি এবং তার সহচরদের যুগে সংকলিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।
ফুয়ূজুল হারামাইন পৃ.৪৯

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হানাফি মাজহাবের প্রশংসা করেছেন, নির্দেশ করেছেন হানাফি মাজহাবের বিরোধিতা না করতে, এবং বলেছেন হানাফি মাজহাবই সুন্নাহর বেশি কাছাকাছি। শাহ সাহেব মুহাদ্দিস ছিলেন, এখন তিনি রাসূলের নির্দেশ মানা ছাড়া কোন উপায় রয়েছে?নেই, তাই তিনি জীবনের শেষ বছরগুলোতে নিজের হানাফিয়্যাত আশআরিয়্যাত, সূফিয়্যাত, স্পষ্ট করে কলমে লিখে দিয়েছেন,যা আমরা আগেই বর্ণনা করেছি।

#তিনি হানাফিদের মাতুরিদি মাজহাব এবং তাহাবীর আকীদাকেও সঠিক মনে করতেন সুবহানাল্লাহ, এবং ইমাম আবূ হানিফা রহ. কে খুব মহব্বত করতেন –শাহ সাহেব লিখেছেন

এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করল, তরীকার ইমাম ও

হাকিকতের কুতুব, শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু—তিনি তাঁর কিতাব আল-গুনিয়া-তে নাজাতপ্রাপ্ত নয় এমন (ভ্রান্ত) দলসমূহের আলোচনা করতে গিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন, সে বিষয়ে।তিনি সেখানে ভ্রান্ত দলগুলোকে বারোটি দলে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে তিনি হানাফিদের কথাও উল্লেখ করেছেন। এরপর বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন—"হানাফিরা হলেন ইমাম আবু হানিফা নু'মানের অনুসারী। তারা মনে করে—ঈমান হলো শুধু স্বীকৃতি দেওয়ার নাম; অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে—সামগ্রিকভাবে সেগুলোর প্রতি স্বীকারোক্তি।

এ কথা তিনি বারহূতী তার প্রসিদ্ধ কিতাবে যেভাবে উল্লেখ করেছেন,সেই সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্নকারী বলেন—এই বক্তব্যের কারণে শায়েখ জিলানী-এর বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি আসে:প্রথম আপত্তি হলো—যে হানাফিরা সর্বসম্মতভাবে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত, যাদের মতামত গ্রহণযোগ্য—তাদেরকে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা,তাদেরকে ভ্রান্ত বলা এবং নাজাতপ্রাপ্ত নয় বলে রায় দেওয়া কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না।দ্বিতীয় আপত্তি

হলো—যে আকীদার কারণে কোনো সম্প্রদায়কে 'মুরজিয়া' বলা হয়, সেগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন এবং হানাফিদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়—হানাফিরা নাকি এসব আকীদায় বিশ্বাসী ও অনুসারী। অথচ বাস্তবতা এমন নয়।তিনি আরও বলেন—মুরজিয়াদের 'মুরজিয়া' বলা হয়েছে এজন্য যে, তারা দাবি করে—যদি কোনো ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলে, এরপর সে যত বড় গুনাহই করুক না কেন, সে কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে—হানাফিরা এ ধরনের বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

এরপর আমি বললাম—ইরজা (অর্থাৎ ঈমান থেকে আমলকে আলাদা করা)-এর দুই প্রকার রয়েছে।১/ প্রকার ইরজা এমন, যা বিশ্বাসকারীকে আহলুস সুন্নাহ থেকে বের করে দেয়।২/আরেক প্রকার ইরজা এমন, যা তাকে আহলুস সুন্নাহ থেকে বের করে দেয় না।প্রথম প্রকার হলো—এই বিশ্বাস করা যে, কেউ মুখে স্বীকার করল ও অন্তরে বিশ্বাস করল—এরপর সে যেকোনো গুনাহ করুক না কেন, তা তার কোনো ক্ষতিই করবে না।এটা ক্ষতিকারক ইরজা।

দ্বিতীয় প্রকার হলো—এই বিশ্বাস করা যে, আমল ঈমানের অংশ নয়; তবে সওয়াব ও শাস্তি আমলের ওপরই নির্ভরশীল।

এই দুই ধরনের (ইরজার) মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো—সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনগণ সর্বসম্মতভাবে মুরজিয়াদের মতকে ভুল বলে রায় দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন—আমলের ওপরই সওয়াব ও শাস্তি নির্ধারিত হয়।অতএব যে ব্যক্তি এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে, সে পথভ্রষ্ট ও বিদআতী হিসেবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় মাসআলাটি এমন কোনো বিষয় নয় যাতে সালাফে সালেহীনের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং এ বিষয়ে বিভিন্ন দলিল পরস্পর বিপরীত প্রতীয়মান হয়। অনেক হাদিস, আয়াত ও আসার রয়েছে যা প্রমাণ করে যে ঈমান আমল নয় (অর্থাৎ ঈমান ও আমল পৃথক)। আবার এমন দলিলও রয়েছে যা থেকে বোঝা যায়—ঈমান বলতে স্বীকৃতি ও আমলের সমষ্টিকে বোঝানো হয়েছে।তবে প্রকৃত বিরোধটি আসলে শব্দগত মাত্র। কারণ সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কোনো গুনাহগার ব্যক্তি ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না এবং সে শাস্তির উপযুক্ত হয়। অতঃপর যেসব দলিল ঈমানকে কথা ও আমলের সমষ্টি হিসেবে প্রমাণ করে, সেগুলো সামান্য চিন্তা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে যাহির অর্থ থেকে ভিন্নভাবে বোঝানো সম্ভব।ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এই দ্বিতীয় মতের অনুসারী ছিলেন। আর তিনি আহলে সুন্নাহর অন্যতম বড় ইমাম ও শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন।

তবে হ্যাঁ, তাঁর মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে এবং ফিকহের শাখাগত বিষয়ে তাঁর অনুসরণকারীদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের মতের জন্ম হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল মু'তাযিলা—যেমন জুব্বাঈ, আবু হাশিম ও যামাখশারী। আবার কেউ ছিল মুরজিয়া, আর কেউ ছিল অন্য ধারার অনুসারী। এরা সবাই ফিকহের শাখাগত বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে অনুসরণ করত, কিন্তু আকীদা ও মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করত না।বরং তারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদাগুলো ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দিকে সম্বন্ধ করত, নিজেদের মাযহাবকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর কিছু বক্তব্যকে আঁকড়ে ধরত ও অপব্যাখ্যা করত। তখন হানাফি মাযহাবের মধ্যকার সত্যপন্থী আলেমগণ—যেমন ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) প্রমুখ—এর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন। তারা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রকৃত মাযহাব সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন এবং তাঁর ওপর আরোপিত ভ্রান্ত মতবাদ থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন।এ বিষয়ে বহু বর্ণনা রয়েছে, যা কিতাবাদি পর্যালোচনা করলে যে কারও কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং হানাফিদের সঙ্গে আহলে সুন্নাহর সম্পর্ক এমন—কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপক, আবার কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ।

যখন তুমি এ বিষয়টি জেনে নিলে, তখন বুঝতে পারবে যে

শায়খ (রহ.) বিভ্রান্ত দলগুলোর আলোচনা করতে গিয়ে সুন্নাহ-বহির্ভূত মুরজিয়াদের কথা উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই তিনি বলেছেন—তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয়। আর তিনি যখন তাদের মধ্যে হানাফিদের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন তার উদ্দেশ্য সেইসব লোক—যারা ফিকহের শাখাগত বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে অনুসরণ করত, কিন্তু দাবি করত যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এই আকীদাগত মাজহাবে তাদের সঙ্গে একমত ছিলেন।

এরপর শায়খ (রহ.) উল্লেখ করেছেন—তারা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কিছু বক্তব্যকে আকড়ে ধরেছিল। যেমন তাঁর এই উক্তি: "ঈমান হলো ইকরার"। যখন আমরা এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলাম, তখন উভয় আপত্তিই একসঙ্গে দূর হয়ে গেল।

এরপর শায়েখ লিখেছেন

فلما قررنا هذا اضمحل الاعتراضان معا وظهر ان الشيخ رضي الله تعالى عنه ما اتهم الامام ابا حنيفة ولا الماتريدية من الحنفية اعاده الله من ذلك

এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শায়খ (রহ.) কখনোই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কিংবা হানাফি মাযহাবের #মাতুরিদিদের ওপর কোনো অপবাদ আরোপ করেননি—আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে তা থেকে নিরাপদ রাখেন। বরং তিনি যে বক্তব্য

তাঁদের দিকে সম্বন্ধ করেছেন, তা আসলে সেই মুরজিয়া গোষ্ঠীর প্রতি, যারা ফিকহে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনুসারী হলেও তাঁর কথার যাহির অর্থ আঁকড়ে ধরে এবং তাঁর বক্তব্যকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ব্যাখ্যা করে নিয়েছিল।তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ ১/২৮

এই আলোচনায়,দেখা গেলে, শাহ সাহেব মাতুরিদিদের পথভ্রষ্ট মনে করেন না।তাই তার কিতাবের কোন কোন জায়গায় দেখা যায় কখনো কখনো তিনি মাতুরিদি আকীদাও গ্রহণ করেছেন,শাহ সাহেব হুজ্জাতুল্লাহর মধ্যে মাতুরিদি আকীদাকে গ্রহণ করে লিখেছেন,

من قال: إن حُسْنَ الأعمال وقُبْحَها من كل وجه فقوله باطل

এর টিকায় সাঈদ আহমদ পালনপূরী রহ লিখেছেন كذلك فرد الإمام المصنف على قول المعتزلة وغيرهم ، وحقق قول الماتريدية ، ولم يتعرض لقول الأشاعرة، فذكر حديثين

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ মুতাযিলিদের মত খণ্ডন করেছেন এবং মাতুরিদিদের মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন,কিন্তু আশ'আরীদের মতের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তিনি মাতুরিদি মাজহাবের পক্ষে দুটি হাদিস দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা,১/৪৯

বিস্তারিত জানতে সাঈদ আহমদ পালনপূরীর তাহকিককৃত নুসখা দেখুন।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, হারামাইন থেকে এসে, তিনি আকীদার ইলমে কালাম এবং তাসাউফের উপর চমৎকার মন্তব্য করেছেন, অথচ জাকারিয়া দেহবাদী লিখেছেন তিনি হারামাইন থেকে এসে ইলমে কালাম থেকে নিজের মুক্তি ঘোষণা করেছেন, নাউজুবিল্লা,"শাহ সাহেবের কথা আর জাকারিয়ার কথা" এখন আপনারা কার কথা বিশ্বাস করবেন, নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিন, শাহ সাহেব লিখেছেন,

الذين يحصل كلامهم نصرة الدين إما بالمجادلة كالمتكلمين أو بـ الموعظة الخطباء الإسلام أو بصحبتهم كمشائخ الصوفية

যাঁদের কথা ও বক্তব্যের মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য হয়—তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের হন:কেউ দ্বীনের পক্ষে তর্ক–বিতর্কের মাধ্যমে সাহায্য করেন, যেমন #ইলমুল কালামের আলেমগণ।কেউ ওয়াজ–নসিহতের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করেন, যেমন ইসলামের খতীবগণ।আর কেউ তাঁদের সংসর্গ ও সাহচর্যের মাধ্যমে দ্বীনের উপকার করেন, যেমন সূফি মাশায়েখগণ।ফুয়ূজুল হারামাইন, পৃ.৬৭

তিনি হারামাইন থেকে এসে সূফিদের মুসালসাল বর্ণনাও লিখেছেন, শুধু লিখেন নি সালাফি দেহবাদীদের মুসালসাল বর্ণনা। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখের।

#শাহ ওয়ালীউল্লাহ হারামাইনে যাওয়ার আগেও ইলমে

কালামের প্রশংসা করেছেন, যেমন তিনি তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ নামক কিতাবটিতে তিনি লিখেছেন,

يفيض من الملا الاعلى علوم على النفوس التي وصفنا امرها فتحيط تلك النفوس ما تختزنها و تقتنيها فينبع من نفوسهم علمان شريفان احدهما علم الاحكام ان الشيء الفلاني واجب و الشيء الفلاني حرام والثاني علم المخاصمة باهل الضلال وذلك ان كثيرا ما يظهر عاداتهم الفاسدة واقاويلهم الباطلة وشبهاتهم الردية ويظهر منافرتها العلوم الحقة وينعقد لسخط وازدراء فتنفسخ في صدور ألئك إنشاة الكرام اقوال واجوبة لها وهذان العلمان من اعظم علوم القرآن و نحن نذكر في هذه الأوراق شعبة من علم المخاصمة

আমরা যাদের অবস্থার বর্ণনা করেছি—সে ধরনের নফসগুলোর ওপর মালাউল আলা আলা- (উচ্চতম জগত) থেকে জ্ঞান প্রবাহিত হয়। সেই নফসগুলো ওই জ্ঞান গ্রহণ করে, নিজের ভেতরে সংরক্ষণ করে এবং আত্মস্থ করে। ফলে তাদের নফস থেকে দু'টি সম্মানিত জ্ঞান উৎসারিত হয়।একটি হলো আহকামের জ্ঞান—যেমন, অমুক বিষয় ফরজ-ওয়াজিব, অমুক বিষয় হারাম।আর দ্বিতীয়টি হলো ভ্রান্তপন্থীদের সঙ্গে বিতর্ক ও মোকাবিলার জ্ঞান(ইলমে কালাম)। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, ভ্রান্তদের নিকৃষ্ট অভ্যাস, বাতিল কথাবার্তা ও দুর্বল আপত্তিগুলো প্রকাশ পায় এবং সেগুলো সত্য জ্ঞানের সঙ্গে তার বিরোধিতাকেও স্পষ্ট করে

দেয়। তখন ওই সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানী নফসগুলোর অন্তরে তাদের প্রতি অসন্তোষ ও ঘৃণা জন্ম নেয়। এর ফলেই তাদের বুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক বক্তব্য ও জবাব গঠিত হয়।
এই দুই জ্ঞান—আহকামের জ্ঞান এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে বিতর্কের জ্ঞান—কুরআনের সর্বোত্তম ও মহান জ্ঞানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।আমরা এই লেখাগুলোতে ভ্রান্তির বিরুদ্ধে বিতর্কবিদ্যা তথা ইলমে কালামের একটি শাখা আলোচনা করব।তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ,.১/২০২

এখানেই শেষ নয়, শাহ সাহেব ইলমে কালামের ওপর ছোট একটি রিসালাও রচনা করেছেন— রিসালাটির নাম রিসালায়ে দানিশমান্দ —সেখানে ইলমে কালামের মধ্যে তার নিজ সনদ আবুল হাসান আশআরি পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, দেখা যাচ্ছে সনদের মধ্যে সবগুলো আশআরি মুতাকাল্লিম ইমাম,সেই সনদে কোন আসারি হাম্বলী দেহবাদী ইমামের নেই সুবহানাল্লাহ, লক্ষ করুন,তিনি লিখেছেন –
اما بعد گوید فقیر ولی اله بن عبدالرحیم ایں بنده فن دانشمندی از والد خود کسب نموده و ایشان از میر محمد زاہد بن قاضی اسلم ہروی ، دایشان از ملا محمد فاضل ، وایشان از ما بوست ملامحمد ، قراباغی ، و ایشان از میر زاجان، وایشان از ملا محمود شیرازی، و ایشان از ملا جلال الدین دوانی و ایشان از والد خود ملا اسعد بن عبدالرحیم و از ملا مظہر

الدین گازرونی و پایشاں هر دو از ملا سعد الدین تفتازانی و از سید شریف جور جانی و ایشان از قطب الدین رازی وایشان و ملا سعد الدین تفتازانی و هر دو از قاضی عضد و ایشان از ملا زین الدین ایشان از قاضی بیضاوی - وایشان را سند یست تا شیخ ابو الحسن اشعری در کتب تاریخ مشهور و معروف . الجمله فقیر این سند اخذ کرد فن دانشمندی و علم کلام و اصول همه مخلوط با هم. ورجال این سند بر مصنفین محققین مشغول به تصنیف و درس بودند الا والد فقیر که به سبب اشتغال قلبی شغل تصنیف و اکثار درس نپر داختند. بخاطر خاطر گذشت که فن دانشمندی را قاعده بند و براہل عصر آن قاعده را جلوه دهد.

এই অধম বান্দা ওয়ালীউল্লাহ ইবনে আব্দুর রাহীম বলেন:আমি এই জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যর শাস্ত্র আমার পিতা থেকে অর্জন করেছি। তিনি তা গ্রহণ করেছেন মীর মুহাম্মদ জাহিদ ইবনে কাজী আসলাম হারভী থেকে। তিনি নিয়েছেন মোল্লা মুহাম্মদ ফাযিল থেকে; তিনি মোল্লা মুহাম্মদ কারাবাগী থেকে; তিনি মীর যাজান থেকে; তিনি মোল্লা মাহমূদ শিরাজী থেকে; তিনি মোল্লা জালালুদ্দীন দাওয়ানী থেকে; তিনি তাঁর পিতা মোল্লা আস'আদ ইবনে আব্দুর রাহীম এবং মোল্লা মাযহারুদ্দীন গাজরূনী—এই উভয়ের কাছ থেকে।আর এই দু'জনই গ্রহণ করেছেন মোল্লা সা'দুদ্দীন তাফতাজানী ও সাইয়্যিদ শরীফ জুরজানী থেকে।

তাঁরা দু'জনই শিখেছেন কুতুবুদ্দীন রাজী থেকে। আর কুতুবুদ্দীন রাজী ও মোল্লা সা'দুদ্দীন তাফতাজানী—উভয়েই গ্রহণ করেছেন কাজী ইযুদ্দীন থেকে। তিনি গ্রহণ করেছেন মোল্লা যায়নুদ্দীন থেকে, আর তিনি কাজী বায়যাবী থেকে।এঁদের সকলেরই প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে #ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রহ.) পর্যন্ত সংযুক্ত সনদ বিদ্যমান।সারকথা, এই অধম ব্যক্তি এই সনদের মাধ্যমে পাণ্ডিত্য, ইলমে কালাম ও উসূল—এই সমস্ত শাস্ত্র একত্রে অর্জন করেছেন।এই সনদের সকল ব্যক্তিই ছিলেন গবেষক, গ্রন্থকার এবং পাঠদানকারী আলিম; কেবল আমার পিতা ব্যতীত—কারণ তিনি অন্তরের ব্যস্ততার(আধ্যাত্মিক ইলমের) কারণে গ্রন্থ রচনা ও অধিক পাঠদানে মনোনিবেশ করতে পারেননি।

এই রেসালাটি মজমূউ রাসায়িশ শাহ ওয়ালীউল্লাহতে বিদ্যমান রয়েছে।

হারামাইনে তাসাউফি শায়েখ থেকে তাসাউফি স্বপ্ন ভারতে এসে বর্ণনা করেছেন –

হারামাইন শরীফে ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর নিজ সনদের একজন শায়েখ সম্পর্কে বলেন;আমি শায়খ

তাজুদ্দীন হানাফি সূফি (রহ.)-এর কাছ থেকে এক আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ঘটনা শুনেছি।উল্লেখ্য হারামাইনে শায়েখ তাজুদ্দীন থেকে শাহ সাহেব বুখারীর সনদ নিয়েছেন।

শায়েখ তাজউদ্দীন বলেন—একবার আমি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। অসুখটি এত দীর্ঘস্থায়ী হয় যে চরম দুর্বলতার কারণে হাত-পা নাড়ানোর শক্তিও আমার আর অবশিষ্ট ছিল না। এই অবস্থায় এক রাতে স্বপ্নে দেখি—কেউ এসে বলছে:
“একটি মুরগি রান্না করে তার উপর সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে রোগীকে খাওয়ানো হোক, যাতে সে তা খেয়ে আরোগ্য লাভ করে।”ঘুম থেকে জেগে উঠে আমি এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।পরবর্তী রাতে আবার স্বপ্নে দেখি—ইমাম মুহাম্মদ ইমাম বুখারী (রহ.) আমার সাধারণ গৃহে তাশরীফ এনেছেন। তিনি নিজ হাতে হাঁড়ি চুলায় বসিয়ে আগুন জ্বালালেন এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুরগি রান্না করতে থাকলেন। রান্না সম্পন্ন হলে তা আমার সামনে এনে রাখলেন এবং বললেন—“আমি এ খাদ্যের উপর সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করেছি, এখন এটি খাও।”আমি তা খাওয়ামাত্র এমন আশ্চর্য রকমের আরাম ও সুস্থতা অনুভব করলাম যে অসুখের কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট রইল না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হয়ে উঠে

বসলাম।ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এই অসামান্য অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে আমার অন্তরে যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা কেবল সুস্থ হয়ে ওঠার আনন্দের থেকেও অধিক ছিল।আনফাসুল আরেফিন, পৃ.৪৮৮

শাহ ওয়ালীউল্লাহ তার পিতার তাসাউফি ঘটনা নকল করে লিখেছেন, সম্মানিত পিতা যখনই মাখদূমী শাইখ মুহাম্মদ ফুলতী-এর পবিত্র কবরের পাশে বসতেন, তখন বলতেন—"তাঁর রূহ নামাজে আমার ইমামতি অনুসরণ করে এবং আমার কাছ থেকে মারেফত অর্জন করে।একবার তিনি এই ফকীর-এর প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং কিছু ফয়েজ ও মারেফত দান করলেন। তারপর বললেন"মাখদূমী শাইখ মুহাম্মদ ফুলতী (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর পবিত্র রূহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, অমুক (ওয়ালীউল্লাহ)-কে কিছু মারেফতের শিক্ষা দিতে। সে সমস্ত বিষয়ই আমি তোমার সামনে এখন ব্যাখ্যা করে দিয়েছি।আনফাসুল আরেফিন, পৃ.১৭১

আনফাসুল আরেফিন কিতাবটি শাহ সাহেব হারামাইন থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর লিখেছেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ হারামাইনের শায়েখদের থেকে সুফিদের

তাসালসুল হাদীস বর্ণনা করেছেন,শুরুতেই তিনি তাসাউফ বিষয়ে নিজ পরিচয় দিয়ে লিখেছেন,

قال الفقير ولي الله عفى عنه - وله اتصال قوي بغالب الطرق الصوفية صحبة وتلقينا وإلباسا للخرقة وإجازة للإرشاد ومعرفة بطريق السلوك على رأى المتقدمين والمتأخرين جميعا والحمد لله -

ফকির বান্দা ওলীউল্লাহ– বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমার অধিকাংশ সুফি তরিকার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক আছে।সোহবত, শিক্ষা গ্রহণ, খিরকা পরিধান, ইরশাদের অনুমতি লাভ–সব দিক থেকেই।এ ছাড়া আমি আত্মিক সাধনার পথ (তরীকে সুলূক) সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলিম-সুফিদের মতামত ও পদ্ধতি ভালোভাবে জানি।

এরপর তিনি সনদ বর্ণনা করেছেন এভাবে,

أخبرني الشيخ أبو الطاهر الصوفي سماعا عليه، قال قرأت على أبي الشيخ إبراهيم الكردي العارف المحقق الصوفي ، قال قرأت على الشيخ العارف بالله الصوفي الشيخ أحمد القشاشي ،

শায়েখ আবু তাহের -সুফি আমাকে সরাসরি শুনিয়ে বলেছেন।তিনি বলেন: আমি আমার পিতা শায়েখ ইবরাহিম আল-কুর্দি–যিনি ছিলেন একজন আরিফ, সুদৃঢ় গবেষক ও সুফি–এর কাছে পাঠ করেছি।আর তিনি বলেন: আমি আল্লাহর আরিফ সুফি-সম্রাট শায়েখ আহমদ

আল-কশ্শাশি-এর কাছে পাঠ করেছি।
মুসালসাল বর্ণনা, ১২–

এভাবে তিনি হারামাইনের শায়েখদের থেকে তাসাউফের ওপর ১২ থেকে সতেরো অর্থাৎ প্রায় ৫ টি মুসালসাল বর্ণনা উল্লেখ করেছেন,অন্যান্য মুসালসাল থেকে এটা সবচেয়ে বেশি। সুবহানাল্লাহ।
শাহ সাহেব বলেন, তিনি নিজে সূফি সূফিদের বিষয়ে ভালো জানেন, মুরিদ বানানোর এজাজত আছে এবং সুফিবাদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে, এবং লিখেছেন তার শায়েখ আবূ তাহেরো একজন সূফি। অথচ আমাদের দেহবাদি জাকারিয়া সাহেব লিখেছেন,শাহ সাহেব নাকি আবূ তাহের কুরদীর নিকট গিয়ে তাসাউফ ভ্রান্তি থেকে পবিত্র হয়েছেন, যেখানে শাহ সাহেবের বিবরণ মতো দেখা যাচ্ছে আবূ তাহের কুরদী নিজেই একজন সূফি, আর শাহ সাহেবের নিজেরই সূফিদের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।তাই স্পষ্ট হয়,জাকারিয়া সাহেব মিথ্যাচার করেছেন।উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে,শাহ সাহেবের আকীদা, মাজহাব তাসাউফ কোনটিতেই কোন পরিবর্তন হয়নি হারামাইনে যাওয়ার পর এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। বরং হারামাইনে তার সকল শায়খই ছিলেন, আশআরি, হানাফি/শাফেই এবং সূফি।

তাসাউফের আলোচনা শেষ করছি শাহ সাহেবের একটি উক্তি দিয়ে, শাহ সাহেব তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহতে লিখেছেন,
علم حق در علم صوفی گم شد
আল্লাহর প্রকৃত জ্ঞান সুফিদের জ্ঞানের মধ্যে নিহিত হয়ে গেছে।তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ, ১/১৮

লিখেছেন মাওলানা Ayeatullah Ali Ahnaf হাফিযাহুল্লাহু তাআলা

শাহ ওয়ালীউল্লাহর আকীদা বনাম সালাফি আকীদা, (পর্ব২—)

শাহ ওয়ালীউল্লাহর তাফউজ,উসূলীভাবে আমরা সংক্ষেপে শাহ সাহেবের তাফউইজের বক্তব্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবো—আমি বলবো,এই অধ্যায় পড়ার আগে জাকারিয়া সাহেব শাহ ওয়ালীউল্লাহর আকীদা বিষয়ে যা লিখেছেন,তা একবার পড়ে নিন,তাহলে উনার ধোঁকাবাজিটা শনাক্ত করা আপনাদের জন্য সহজ হবে।

1 ⬜ শাহ ওয়ালীউল্লাহর দৃষ্টিতে সিফাতের নুসূসগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন, মানুষ

জানেনা, কিন্তু সালাফিদের দৃষ্টিতে এগুলোর অর্থ এবং উদ্দেশ্য মানুষ জানে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ, ইবনে হাজারের বক্তব্য এনে তাফউইজ প্রমাণ করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ বলেছেন–ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন,

فدل أنهم اتفقوا على الإيمَان بِهِ على الوَجْه الذِي أرَادَ الله تعَالى مِنْهَا،وَأوجب تنزيهه عَن مشابهات المَخْلُوقَات

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে সাহাবায়ে কেরাম, সবাই এসব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন ঠিক সেই অর্থ ও পদ্ধতিতে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা নিজে তা উদ্দেশ্য করেছেন,(আর আল্লাহর উদ্দেশ্য আমরা জানিনা) এবং আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত জেনেছেন– হুজ্জাতুল্লাহ

ইবনে হাজারের দৃষ্টিতে এটি আশআরিদের আকীদা,সালাফিদের আকীদা নয়, কারণ সালাফিদের আকীদা হলো এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য তারা জানে।যেমন ইবনে হাজার' ইবনে তাইমিয়ার তওবা বিষয়ে লিখেছেন যে তিনি রুজু করেছেন এই বক্তব্য দিয়ে যে আমি আশআরি,এবং এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন, তার মানে হলো তওবার আগে তার

আকীদা ছিলো, এগুলোর অর্থ ইবনে তাইমিয়া জানার দাবি করতেন।আশআরি হওয়ার পর বলতেছেন,এগুলোর অর্থ শুধু আল্লাহ তায়ালা জানে।আর ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী যেহেতু বারবার নিজেকে আশআরি বলেই দাবি করে আসছিলেন এজন্যই তিনি ইবনে হাজার আশআরির বক্তব্যটি নকল করেছেন।ইবনে হাজারের সেই বক্তব্যটি হলো এই,

وَلَا أعلم كنه المُرَاد بِهِ بل لَا يُعلمهُ إِلَّا اللّٰه

দুরারুল কামিনাহ, ১/১৭২

2 🟦 শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর দৃষ্টিতে সিফাতের নুসূসগুলোতে শব্দগুলোর যাহির বা প্রকাশ্য অর্থ কখনো উদ্দেশ্য নয়,কিন্তু সালাফিদের দৃষ্টিতে এগুলোর প্রকাশ্য বা যাহিরি অর্থ উদ্দেশ্য। যেমন ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে তাইমিয়ার তওবা নিয়ে লিখেছেন,যে ইবনে তাইমিয়া তওবার সময় বলেছেন, أنا أشعري الرحمن على العَرْش اسْتَوَى ليس على ظاهره আমি আশআরি এবং সিফাতের নুসূসগুলো বাহ্যিক অর্থের ওপর নয়। এর মানে হলো তওবার আগে তার আকীদা ছিলো, এগুলো বাহ্যিক অর্থের ওপরই প্রযোজ্য, এমন।নাউজুবিল্লাহ। দুরারুল কামিনাহ,ইবনে হাজার ১/১৭২ প্রখ্যাত সালাফি, রাদ্দুশ শামিল প্রণেতা

লিখেছেন,مع شيء من المعني أي لا يفهم تفويض المعني القطع ظاهرة غير مراد ، অর্থের তাফয়িজ হল;অকাট্যভাবে বাহ্যিক অবস্থা উদ্দেশ্য না হওয়ার সাথে অর্থ থেকে কিছু বোঝা না যাওয়া। রাদ্দুশ শামিল, পৃ.৯৩

শাও ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীও ইবনে তাইমিয়ার অনুসারীদের ব্যাপারে মনে করেন যে তারা যাহির উদ্দেশ্য নেওয়াকে সঠিক আকীদা মনে করে এবং যাহির উদ্দেশ্য না নেওয়াকে ভ্রান্ত আকীদা মনে করে,তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অবস্থান বোঝাতে গিয়ে এক চিঠির জবাবে যা লিখেছেন তার আরবী অনুবাদ হুবহু তুলে ধরা হলো –তিনি লিখেছেন,

و قد ذكر أنه قال : ان الله تعالى فوق العرش ، و التحقيق أن في هذه المسئلة ثلاث مقامات : أحدها البحث عما يصح اثباته للحق توقيفا، و عما لا يصح توقيفا، و الحق في هذا المقام ان الله تعالى أثبت لنفسه جهة الفوق ، و أن الاحاديث متظاهرة على ذلك ، و قد نقل الترمذى ذلك عن الامام مالك ونظرائه . و ثانيها ان العقل هل يجوز هذا الكلام حقيقة ؟ أو يوجب حمله على المجاز ؟ والحق في هذا المقام أن العقل يوجب أنه ليس على ظاهره في نفس الأمر. و ثالثها أنه هل يجب تأويله ؟ أو يجوز وقفه على ظاهره من غير تعيين المراد ؟ و الحق فيه انه لم يثبت في حديث صحيح او ضعيف انه يجب تأويله ، و لا أنه لا يجوز استعمال مثل تلك العبارات من الأمة .

و كلام ابن تيمية محمول على المقام الأول و الثالث .

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে।শাহ সাহেব বলেন, বাস্তব সত্য হলো—এই মাসআলায় তিনটি স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর হলো— আল্লাহ তাআলার জন্য কী কী বিষয় প্রমাণ করা যায়, আর কী কী প্রমাণ করা যায় না—এ বিষয়ে আলোচনা।

এই স্তরে সঠিক কথা হলো: আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য জিহাতুল ফাওক সাব্যস্ত করেছেন, এবং এ বিষয়ে হাদিসসমূহ একে অপরকে শক্তিশালী করে।ইমাম তিরমিজি এ কথা ইমাম মালিক ও তাঁর সমমর্যাদাসম্পন্ন ইমামদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় স্তর হলো—আকল কি এ বিষয়গুলোকে বাস্তব অর্থে গ্রহণ করতে দেয়, না কি একে রূপক অর্থে গ্রহণ করতে বাধ্য করে?এই স্তরে সঠিক কথা হলো: বাস্তব সত্যের বিচারে আকল এ কথা দাবি করে যে, এটি তার বাহ্যিক অর্থে উদ্দেশ্য নয়।

তৃতীয় স্তর হলো—এ বিষয়ে কি অবশ্যই তাওয়ীল করতে হবে,নাকি নির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ না করে বাহ্যিক শব্দের অর্থের উপর ঈমান রেখে থেমে থাকা জায়েয?

এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো:কোনো সহিহ বা দুর্বল হাদিসেও এ কথা প্রমাণিত হয়নি যে, অবশ্যই তাওয়ীল করতে হবে; আবার এটাও প্রমাণিত নয় যে, উম্মতের পক্ষে এ ধরনের শব্দব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

শাহ সাহেব লিখেছেন,ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য প্রথম ও তৃতীয় স্তরের দিকেই প্রযোজ্য।অর্থাৎ বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য এমন।হায়াত শাহ ওয়ালীউল্লাহ, পৃ.২৬.২৭

শাহ সাহেব এখানে যে অবস্থানটি ইবনে তাইমিয়ার দিকে সম্পৃক্ত করেননি সেটি হলো, যাহির উদ্দেশ্য না নেওয়ার অবস্থানটি,কিন্তু শাহ সাহেবের অবস্থান হলো ইবনে তাইমিয়ার প্রথম এবং তৃতীয় স্তর বাদ দিয়ে দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য না,এমন।তিনি হুজ্জাতুল্লাহর মধ্যে লিখেছেন–

فَكَانَ حكم الشّرْع النّهْي عَن اسْتِعْمَالهَا دفعا لتِلْك الْمفْسدَة، وَكثير من الصِّفَات يُوهم اسْتِعْمَالهَا على ظواهرها خلاف المُرَاد، فَوَجَبَ الِاحْتِرَاز عَنْهَا فلهذه الحكم جعلهَا الشّرْع توقيفية، وَلم يبح الْخَوْض فِيهَا بِالرَّأْيِ.

অতএব শরিয়তের বিধান হলো—এসব শব্দ ও গুণাবলিকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা, যাতে ঐ বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কেননা অনেক গুণাবলি আছে, যেগুলোকে বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করলে প্রকৃত উদ্দেশ্যের

বিপরীত অর্থ বোঝায়। তাই সেসকল সিফাতের বাহ্যিক অর্থ ব্যবহার থেকে সতর্ক থাকা জরুরি। এই হিকমতের কারণেই শরিয়ত এসব বিষয়কে ‘তাওকিফি’ (কেবল কুরআন–হাদিসে যতটুকু এসেছে ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ) করেছে এবং নিজ মত দিয়ে (অর্থ করে) এগুলো নিয়ে গভীর আলোচনায় প্রবেশ করার অনুমতি দেয়নি।হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা,১/১২৪

শাহ সাহেব আবূ হানিফার মতকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে লিখেছেন,যে সমস্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে,আমল ঈমান থেকে পৃথক নয়,
ثم الدلائل الدالة علي أنه المجموع يمكن صرفها عن ظاهرها بأدني عناية ،

সামান্যতম ব্যাখ্যা ও চিন্তা-ভাবনা করলেই সেগুলোকে বাহ্যিক (শব্দগত) অর্থ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব।তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ ১/২৮

শাহ সাহেব হুজ্জাতুল্লার একই জায়গায় মারাত্মক একটি বিষয় বুঝিয়েছেন, যা বুঝলেই আকীদার মারপেঁচ বুঝা একদম সহজ হয়ে যায়,এবং বাহ্যিক অর্থ যে উদ্দেশ্য নয় তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়, তিনি লিখেছেন -
أَقُول لَا فرق بَين السّمع وَالْبَصَر وَالْقُدْرَة والضحك وَالْكَلَام والا

استواء فَإِن الْمَفْهُوم عِنْد أهل اللِّسَان من كل ذَلِك غير مَا يَلِيق بجناب الْقُدس،

আমি বলি– শোনা (সামা'), দেখা (বাসার), ক্ষমতা (কুদরাত), হাসা (দাহিক), কথা বলা (কালাম) ও ইস্তিওয়া–এসব গুণের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কারণ ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে এসব শব্দের যে অর্থ বোঝা যায়,তা আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য উপযুক্ত নয়।

আমরা এটির অনুবাদ অন্যভাবেও লিখি -
ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে এসব শব্দ থেকে যা বোঝা যায়,তা আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য উপযুক্ত নয়।
একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন, এসব শব্দ থেকে আল্লাহর শানে উপযুক্ত নয় এমনকিছু তখনই বুঝা যাবে যখন আপনি এসব শব্দের অর্থ করবেন।

এরপরে শাহ সাহেব বুঝাচ্ছেন যে সিফাতের নুসূসগুলো থেকে আসলে কি বুঝা যায়, তিনি বলেন
وَهل فِي الضحك اسْتِحَالَة إِلَّا من جِهَة أَنه يَسْتَدْعِي الْفَم، وَكَذَلِكَ الْكَلَام؟ وَهل فِي الْبَطْش وَالنُّزُول اسْتِحَالَة إِلَّا من جِهَة أَنهمَا يستدعيان الْيَد وَالرجل؟ وَكَذَلِكَ السّمع وَالْبَصَر يستدعيان الْأذن وَالْعين، وَالله أعلم.

তবে হাসার ক্ষেত্রে কি কোনো অসম্ভবতা আছে—শুধু এ দিক ছাড়া যে, হাসা মুখের অস্তিত্ব দাবি করে?ঠিক তেমনি কথা বলার ক্ষেত্রেও কি অসম্ভবতা আছে—শুধু এ দিক ছাড়া যে, তা মুখের প্রয়োজন বোঝায়?আবার ধরা বা পাকড়াও করা (বাত্শ) এবং নেমে আসা (নুযূল)—এর মধ্যেও কি কোনো অসম্ভবতা আছে—শুধু এই দিক ছাড়া যে, এগুলো হাত ও পায়ের অস্তিত্ব বোঝায়?ঠিক একইভাবে শোনা ও দেখা—এগুলোও তো কান ও চোখের অস্তিত্ব বোঝায়,।

শাহ সাহেব এখানে স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন যে,সিফাত-সংক্রান্ত নুসূসগুলো ভাষাগতভাবে শুনলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, জায়গা ও দিকের ধারণা সৃষ্টি করে। তাই এসব শব্দকে সরাসরি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অর্থে গ্রহণ করাই মূল সমস্যা। তিনি শুরুতেই বলেছেন, ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে এসব শব্দ থেকে যা বোঝা যায়, তা আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য উপযুক্ত নয়; কারণ এগুলো থেকে মূলত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মাকান ও দিকের ধারণাই বোঝা যায়।আর এসমস্ত ভ্রান্তি তখনই ধরা পড়ে যখন এগুলো তাফউইজ তথা আল্লাহর উদ্দেশ্যের নিকট সোপর্দ না করে অর্থ করা হয়,তখন।তাই শাহ সাহেব প্রথমেই লিখেছেন,এগুলোর অর্থ করা যাবেনা,অন্যভাবে বললে বাহ্যিক বিষয় উদ্দেশ্য নেওয়া

যাবেনা।কারণ বাহ্যিক থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকার বিষয়টি বুঝা যায়।

শাহ সাহেবের বক্তব্য হলো—এই সিফাতগুলোর নুসূস বিশ্বাস করতে হবে এবং সেগুলো ব্যবহার করা যাবে, তবে এমন কোনো অর্থ গ্রহণ করা যাবে না যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দিক বা জায়গা বোঝায়। তিনি আরও পরিষ্কার করেন যে, মুহাদ্দিসরাও এসব সিফাত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তারা এগুলোকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অর্থে নেননি; বরং কেবল সিফাত হিসেবেই মেনে নিয়ে থেমে গেছেন। তাই তাদের ওপর কোনো আপত্তি বা দোষারোপ করা সঠিক নয়, কারণ তারা আল্লাহর শানে অনুপযুক্ত অর্থ উদ্দেশ্য করেননি।অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, জায়গা, দিক ও জিসিমের ধারণা আল্লাহর জন্য নাকচ—এ কথা শাহ সাহেব বহু জায়গায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আকীদাতুল হাসানা গ্রন্থেও তিনি একইভাবে এসব বিষয় থেকে আল্লাহ তাআলাকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করেছেন।তিনি লিখেছেন –

وَهُوَ بَرِى عَنِ الحُدُوثِ وَالتّجَدُ دِ مِنْ جَمِيعِ الوُجُودِ لَيْسَ بِجَوهَرٍ وَلا عرض وَلَا جُسم وَلَا فِي حَيْرز وَجِهَةَ وَلَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِهُنَا وَهُنَاكَ وَلَا يَصح عَلَيْهِ الحَرَكَةُ وَالْإِنتِقال والتبدل في ذاته ولا صِفَاتِهِ

আল্লাহ তাআলা সব ধরনের হুদূস এবং নতুনত্ব থেকে

পবিত্র। তিনি কোনো (জওহার) নন, কোনো (আরয) নন, কোনো দেহ বা শরীর নন। তিনি কোনো সীমা, স্থান বা দিকের মধ্যে আবদ্ধ নন। তাঁকে ‘এখানে’ বা ‘ওখানে’ বলে ইশারা করা যায় না। তাঁর ক্ষেত্রে চলন, স্থানান্তর বা রূপান্তর সঠিক নয়—না তাঁর সত্তায়, না তাঁর গুণাবলিতে।আল আকীদাতুল হাসানা, পৃ.৫

জওহার মানে এমন জিনিস যার অস্তিত্বের জন্য, সময় এবং জায়গা প্রয়োজন।

আরয মানে এমন জিনিস, যার অস্তিত্বের জন্য আকৃতি, রং,কাইফ, প্রয়োজন। অর্থাৎ শাহ সাহেব এগুলো আল্লাহর জন্য অনুপযুক্ত মনে করেন।

শাহ সাহেবের বর্ণনা করা, উসূলগুলো এবং মাসআলাগুলো একে অপরের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি বলেন যে, সিফাতের শব্দগুলো যেমন আইন, উজুন, ইস্তাওয়া, নুজুল ইত্যাদি, এইসব থেকে শুনামাত্রই যা বুঝা যায় তা আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ, যখন আমরা এই শব্দগুলো শুনি, আমরা বুঝি এগুলোর জন্য শরীর, জায়গা, দিক, রং, এবং আকার দরকার।দেখা যাচ্ছে, শাহ সাহেব এসবকে আল্লাহর জন্য মেনে নেন না এবং জানান,এসব সিফাতের নুসূস বিশ্বাস করতে হবে, তবে কোনো আঙ্গিক, দিক, বা আকার নির্ধারণ করা যাবে না। তিনি আরও বলেন যে,

হাদিসবিদরাও এসব সিফাতের ক্ষেত্রে কোন আঙ্গিক বা আকার নির্ধারণ করেন না, তাই তাদের সমালোচনা করা উচিত নয়। শাহ সাহেব লিখেছেন,

واستطال هَؤُلَاء الخائضون على معشر أهل الحَدِيث، وسموهم مجسمةومشبهة، وَقَالُوا هم المتسترون بالبلكفة، وَقد وضح عَليّ وضوحا بَينا أن استطالتهم هَذِه لَيست بِشَيْء وانهم مخطئون فِي مقالتهم رِوَايَة ودراية وخاطئون فِي طعنهم أئِمّة الهدى.

এইসব বিষয়ে যারা(মুতা'যিলা, জাহমিরা) অযথা গভীর আলোচনায় লিপ্ত হয়েছে, তারা মুহাদ্দিসদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করেছে, তাদেরকে মুজাসসিমা ও মুশাব্বিহা বলে আখ্যায়িত করেছে।তারা আরও বলেছে—মুহাদ্দিসরা নাকি কৌশলে নিজেদের আড়াল করে রেখেছে।কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার ওসুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে—এইসব লোকদের এ ধরনের বাড়াবাড়ি একেবারেই ভিত্তিহীন।তারা তাদের বক্তব্যে বর্ণনা ও বোঝাপড়া—উভয় দিক থেকেই ভুল করেছে,এবং তারা হিদায়াতের ইমামদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে মারাত্মক ভুল করেছে।হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা,১/১২৪

শুধু একবার নয়, শাহ সাহেব বারবার লিখেছেন, যে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ অথবা শুনামাত্রই যা বুঝা যায়, তা আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয়,তিনি লিখেছেন –

وتفصيل ذَلِك أن هَهُنَا مقامين: أحدهمَا أن الله تبَارك وَتَعَالَى كيفَ اتّصف بِهَذِهِ الصِّفَات، وَهل هِيَ زَائِدَة على ذَاته أَو عين ذَاته؟ وَمَا حَقِيقَة السّمع وَالْبَصَر وَالْكَلَام وَغَيرهَا؟ فَإِن الْمَفْهُوم من هَذِه الْأَلْفَاظ بَادِي الرَّأْي غير لَائِق بجناب الْقُدس.

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এখানে দুটি পর্যায় আছে।প্রথমটি হলো—আল্লাহ তাআলা কীভাবে এসব গুণ দ্বারা গুণান্বিত হয়েছেন? এসব গুণ কি তাঁর সত্তা থেকে পৃথক কিছু, নাকি তাঁর সত্তারই? আর শ্রবণ, দৃষ্টি, কথা বলা ইত্যাদি গুণগুলোর প্রকৃত স্বরূপই বা কী?কারণ এসব শব্দের যে অর্থ সাধারণভাবে প্রথম দৃষ্টিতে (প্রচলিত ভাষার হিসেবে) বোঝা যায়, তা আল্লাহর পবিত্র মহান সত্তার জন্য উপযুক্ত নয়।
সুবহানাল্লাহ, দেখুন, শাহ সাহেব কতো স্পষ্টভাবে লিখেছেন, এগুলোর থেকে প্রথমবারেই যা বুঝা যায় অথবা যেই অর্থ বুঝা যায়, তা আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয়।

শাহ সাহেব বলেন,
وَالْحق فِي هَذَا الْمقَام أَن النَّبِي صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتَكَلَّم فِيهِ بِشَيْء، بل حجر أمته عَن التَّكَلُّم فِيهِ والبحث عَنهُ فَلَيْسَ لأحد أَن يقدم على مَا حجر

এই পর্যায়ে সঠিক কথা হলো—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনা করেননি; বরং তিনি তাঁর উম্মতকে এ নিয়ে কথা বলা ও তাতে গভীর অনুসন্ধান করা থেকে বিরত রেখেছেন। সুতরাং রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন,সেখানে কারও অগ্রসর হওয়ার অধিকার নেই।হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা,১/১২৪

অথচ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, দেহবাদি ভাইয়েরা এসব সিফাতের ভিতরে কী অর্থ লুকানো আছে তা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন এবং সেই ভিতরগত অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন অর্থ দাঁড় করান, যার ফলেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত হয়ে যায়—আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।
এর বিপরীতে আশআরি ও মাতুরিদিরা এসব সিফাতের ভিতরগত অর্থ খোঁজেন না; বরং আল্লাহর জন্য অনুপযুক্ত কোনো অর্থ নির্ধারণ না করে নুসূসের প্রতি ঈমান রাখেন—আলহামদুলিল্লাহ।শাহ সাহেব এখানে অর্থ নফি করার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন, যা একজন বিবেকবান মানুষ মাত্রই সহজেই বুঝতে পারেন।

শাহ সাহেব যারা দেহবাদি কিংবা মুশাব্বিহা নয় তাদের দেহবাদি এবং মুশাব্বিহা বলতে নিষেধ করেছেন, যা

আপনারা ওপরে দেখেছেন। মুহাদ্দিসরা হাদিস বর্ণনা করেছেন তারা কখনো দেহবাদি নন, মুশাব্বিহা নন।কিন্তু যারা মুহাদ্দিস নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে দেহবাদি তাদের নিন্দা করেছেন শাহ সাহেব, যেমন বর্তমান আহলে হাদীস সালাফিরা, তারা মুহাদ্দিস নয়, কিন্তু নিজেদের আহলে হাদীস বলে পরিচয় দেয়, আহলে হাদীস বলা হয়, যারা মুলত মুহাদ্দিস তাদেরকে।কিন্তু এঁরা মুহাদ্দিস না হয়েও নিজেদের আহলে হাদীস বলে, যা একটা স্পষ্ট প্রতারনা, আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন, এই আহলে হাদীস দাবিদারদের মুখে দাড়ি নেই পাঞ্জাবি নেই টুপি নেই, কোন মাদ্রাসার ছাত্রও নয় হাদিসের ছাত্র হওয়া তো দূরের বিষয়। তারপরও এঁরা নিজেদের আহলে হাদীস বলে,শাহ সাহেব দেবাদিদের নিন্দা করেছেন, বর্তমান আহলে হাদিস সালাফিরাই মুলত কার্রামি দেহবাদীদের প্রকৃত অনুসারী,কেনো বল্লাম কার্রামীদের অনুসারী আসুন জেনে নি। কার্রামি দেহবাদীরা সিফাতের নুসূসগুলোর কাইফ তাফউইজ করে,অর্থ করে।একদম ঠিক বর্তমান আহলে হাদিস সালাফিরাও নুসূসগুলোর কাইফ তাফউইজ করে অর্থ করে,কার্রামিদের কাইফ তাফউইজের বিষয়ে,ইমাম আবুল মুঈন নাসাফি লিখেছেন –

فأما القول بكيفية لا يعرفها الاهو، فهو مما لم يرو عن أحد من اهل السنة البتة. وانما هو شيء روى عن الكرامية الأولى روى

عنهم ابوبكر بن اليمان احد متكلمي سمرقند وكان من القدماء ذكر ذلك في كتابه الذى رد فيه على الكرامية مذاهبهم وهو قول فاسد لما ان الكيفية عبارة عن الهيئات والالوان والاحوال وقد مر القول ببطلان ذلك كله.

আর আল্লাহর জন্য এমন ‘কাইফিয়াত’ সাব্যস্ত করা—যা আল্লাহ জানেন,—এই কথা আহলুস সুন্নাহর কারো থেকে বর্ণিত হয়নি।বরং এই মতটি প্রথমে কাররামিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের থেকেই এই কথা উল্লেখ করেছেন সামরকন্দের একজন মুতাকাল্লিম আলেম আবু বকর ইবনুল ইয়ামান। তিনি তাঁর সেই গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন, যেটি তিনি কাররামিয়াদের মতবাদ খণ্ডন করার জন্য লিখেছিলেন।
আর এই মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; কারণ ‘কাইফিয়াত’ বলতে বোঝায় আকৃতি, রং ও অবস্থা অথচ এগুলোর সবকিছুই আল্লাহর ক্ষেত্রে বাতিল—এ কথা আগেই প্রমাণ করা হয়েছে।তাবসিরাতুল আদিল্লাহ, নাসাফি,পৃ.২১৪–

কার্রামিরা ছিলো প্রসিদ্ধ মুশাব্বিহা, যেটা সালাফিরাও স্বীকার করেন, তাদের মুশাব্বিহা দেহবাদি হওয়ার বিষয়টি আমরা গজনবীর আকীদা বর্ণনার সময় প্রমাণ করেছি,যেহেতু সালাফিরা কার্রামিদের মতোই কাইফ

তাফউইজ করে এবং অর্থও করে, তাই এটি একদম স্পষ্ট,যে কার্রামিদের মতোই সালাফি দেহবাদী!শাহ সাহেব দেহবাদীদের বিষয়ে লিখেছেন –

معنى التشبيه وصوره:والتشبيه عبارة عن إثبات الصفات البشرية (أو أي صفة من صفات المخلوقين) لله - تعالى - فكانوا يقولون مثلا: إن الملائكة بنات الله، وأن يقبل شفاعة عباده ولو لم يرض بها كما يفعل الملوك - أحيانا - مع الامراء الكبار وحكام الولايات، وإنهم - لما لم يستطيعوا إدراك السمع والبصر حسبما يليق بشأن الألوهية - قاسوهما على أسماعهم وأبصارهم، ووقعوا في التجسيم ونسبة التحيز إلى الله - سبحانه

তাশবীহ বলতে বোঝায়—আল্লাহ তাআলার সাথে সৃষ্টির কোনো গুণ মিলিয়ে দেওয়া, অথবা আল্লাহকে মানুষের মতো কল্পনা করা।এ কারণে কিছু লোক এমন কথা বলত,ফেরেশতারা নাকি আল্লাহর কন্যা,আল্লাহ তাঁর বান্দাদের শাফাআত কবুল করেন ঠিক যেমন দুনিয়ার বাদশাহরা কখনো কখনো বড় আমির ও শাসকদের খুশির জন্য অপছন্দ সত্ত্বেও কথা মেনে নেন।আবার তারা আল্লাহর শোনা ও দেখা—এই গুণগুলোকে আল্লাহর মর্যাদার উপযোগীভাবে বুঝতে না পেরে, নিজেদের শোনা ও দেখার সঙ্গে তুলনা করেছে।

এর ফলেই তারা আল্লাহকে দেহযুক্ত মনে করেছে,এবং আল্লাহর জন্য জায়গা ও সীমাবদ্ধতা আছে—এমন ধারণায়

পড়ে গেছে।অথচ আল্লাহ তাআলা এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত।আল-ফাওযুল কাবীর,পৃ.৩৮

শাহ সাহেব, বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রকৃত দেহবাদী বা মুজাসসিমা আসলে কারা!শাহ সাহেব বলে দিয়েছেন, দেহবাদি মুলত তারা, যারা মানুষের গুনকে আল্লাহর জন্য প্রমান করে, যেমন মানুষের হাত,পা, আকার-আকৃতি রয়েছে,আর দেহবাদিরাও আল্লাহর জন্য এগুলো প্রমাণ করে,আর এগুলো প্রমাণ করাকেই শাহ সাহেব দেহবাদ বলেছেন,জানাকথা এগুলো বর্তমান সালাফি দেহবাদীরাই প্রমাণ করে। অর্থাৎ শাহ সাহেবের ভাষ্যমতে বর্তমান সালাফিরাই দেহবাদি। এটার জলজ্যান্ত প্রমাণ হলো, শাহ সাহেব আল্লাহর ইয়াদ রিজল কে অঙ্গ, জিসিম, মনে করেন না,আল্লাহর জন্য জায়গা, এবং দিক ইসবাত করেন না,কারণ এগুলো দেহর বৈশিষ্ট্য, বিপরীতে সালাফিরা দেহের এসমস্ত বৈশিষ্ট্যকে প্রমাণ করে দেহবাদকে প্রমোশন করেছে। শাহ সাহেব কঠোরতার সাথে দেহবাদীদের নিন্দা করে তার বিখ্যাত গবেষণালব্ধ কিতাব, বুদূরে বাযেগাতে লিখেছেন –

ويثبت التشبيه بالدلائل القاطعة في زعمه، ويجزم بانه هو الحق في جهل متراكم و ظلمات بعضها فوق بعض

আর মুশাব্বিহা নিজের দাবিতে অকাট্য প্রমাণ দিয়ে ‘তাশবীহ’প্রমাণ করতে চায়, আর দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়

যে সেটাই সত্য—এটা আসলে স্তরে স্তরে জমে ওঠা অজ্ঞতা, আর অন্ধকারের উপর অন্ধকার।
আল বুদূরুল বাযেগা,পৃ.১৩৯

3 🟦 শাহ ওয়ালীউল্লাহর মাজহাব হলো, সিফাতের নুসূসগুলোর অর্থ না করা। সালাফিদের মাজহাব হলো,নুসূসগুলোর অর্থ করা।নাউজুবিল্লাহ।শাহ সাহেব লিখেছেন –

وَأن يسلب عَنهُ كل مَا لَا يَلِيق بِهِ لَا سِيمَا مَا لهج بِهِ الظالِمُونَ فِي حَقه مثل لم يلد وَلم يُولد، وَقد أجمعت الْملَل السماوية قاطبتها على بَيَان الصِّفَات على هَذَا الْوَجْه، وعَلى أن تسْتَعْمل تِلْكَ العبارَات على وَجهها، وَلَا يبْحَث عَنْهَا أكثر من اسْتِعْمَالهَا،

এবং আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা থেকে এমন সমস্ত বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা, যা তাঁর শানে উপযুক্ত নয়—বিশেষত যা জালিমরা তাঁর সম্পর্কে উচ্চারণ করেছে; যেমন—তিনি সন্তান জন্ম দেন অথবা তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন।আর সমস্ত আসমানি মিল্লাত সর্বসম্মতিক্রমে এ কথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, আল্লাহ তাআলার গুণাবলি(আল্লাহর জন্য উপযুক্ত নয় এমনকিছু নফি করার) পদ্ধতিতেই বর্ণনা করা হবে; এবং এসব গুণবাচক শব্দগুলো তার নির্ধারিত তরিকার মধ্যেই ব্যবহৃত হবে,এবং সিফাতগুলো ব্যবহার করা (লেখা) ছাড়া

এর বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত আলোচনা(অর্থ) করা হবে না।

সুবহানাল্লাহ, এঁরপরেই শাহ সাহেব যা লিখেছেন,তা একজন আহলুস সুন্নাহ অনুসারীর অন্তরকে প্রশান্তি করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, তিনি লিখেছেন –

وعَلى هَذَا مَضَت الْقُرُون الْمَشْهُود لَهَا بِالْخَيرِ، ثمَّ خَاضَ طَائِفَة من الْمُسلمين فِي الْبَحْث عَنْهَا، وتحقيق مَعَانِيهَا من غير نَص، وَلَا برهَان قَاطع، قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " تفكروا فِي الْخلق وَلَا تفكروا فِي الْخَالِق "

এভাবেই কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগগুলো অতিবাহিত হয়েছে। অতঃপর মুসলমানদের একটি দল স্পষ্ট কোনো নস্ কিংবা নিশ্চিত প্রমাণ ব্যতীত সিফাতের নুসূসগুলো নিয়ে অনুসন্ধানে লিপ্ত হয় এবং এর অর্থ নির্ধারণে প্রবেশ করে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করো, কিন্তু স্রষ্টার সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করো না।হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা,১/১২৩

এই এবারতে শাহ সাহেব যেনো বর্তমান দেহবাদী সালাফিদের লক্ষ বলতেছেন, খায়রুল কুরূন অতিবাহিত হলো, সিফাতের নুসূসগুলোর অর্থ না করে, আর তোমরা কোথায় থেকে এসে নুসূসগুলোর অর্থ অনুসন্ধানে লেগে গেছো!আফসোস সালাফিদের জন্য আফসোস।

শাহ সাহেব,উপরে অর্থ নফি করেছেন যা স্পষ্টভাবে এবারত থেকেই বুঝা যাচ্ছে,যেখানে কোন তা'উইল কিংবা পরিবর্তন করা ছাড়াই কেউ অর্থ করতে বাধ্য।উপরের বক্তব্যে অর্থ নফি হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ হওয়ায়,জাকারিয়া দেহবাদী এটি তার বইয়ে উল্লেখ করেননি, দেখছেন বাটপারি! কিন্তু শাহ সাহেব অর্থ নফির যে দলিল উল্লেখ করেছেন সেটি উল্লেখ করেছে,শাহ সাহেব অর্থ নফি করার দলিল এনেছেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস এবং ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ একটি বক্তব্যের মাধ্যমে, তিনি অর্থ নফি করে পরপরই দলিল দিয়ে লিখেছেন,

قَالَ النّبِي صَلّى اللّٰه ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " تفكّرُوا فِي الخلق وَلَا تفكّرُوا فِي الخَالِق " وَقَالَ فِي قَوْله تعَالَى:{وَأن إِلَى رَبك الْمُنْتَهى ". لَا فكرة فِي الرب ".وَالصِّفَات لَيست بمخلوقات محدثات، و التفكر فِيهَا إِنّمَا هُوَ أن الْحق كَيفَ اتّصف بهَا، فَكَانَ تفكر فِي الخَالِق، قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي حَدِيث " يَداللّٰه ملأى "، وَهَذَا الحَدِيث قَالَ الْأَئِمّة نؤمن كمَا جَاءَ من غير أن يُفَسر أو يتَوَهّم هَكَذَا قَالَ غير وَاحِد من الْأَئِمّة، مِنْهُم سيفان الثّوْرِيّ، وَمَالك بن أنس، وَابْن عُيَيْنَة، وَابْن الْمُبَارك: أنه تروى هَذِه الْأَشْيَاء ويؤمن بهَا، وَلَا يُقَال كَيفَ وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: إِن إجْرَاء هَذِه الصِّفَات كمَا هِيَ لَيْسَ بتشبيه، وَإِنّمَا التّشْبِيه أن يُقَال: سمع كسمع وبصر كبصر

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:“সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো, কিন্তু স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না।”আর তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর প্রসঙ্গে বলেছেন:— “নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের কাছেই সকল কিছুর সমাপ্তি।”অতএব, রবের সত্তা সম্পর্কে কোনো চিন্তা ফিকির করা যাবে না।আর আল্লাহর গুণাবলি কোনো সৃষ্ট বস্তু নয়।আর সিফাত নিয়ে চিন্তা করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে—আল্লাহ তাআলা কীভাবে সেগুলো দ্বারা গুণান্বিত হয়েছেন,তা নিয়ে ভাবা। আর এ ধরনের চিন্তা মূলত খালিক সম্পর্কে চিন্তা হয়ে যায় (যা নিষিদ্ধ)।ইমাম তিরমিযি (রহ.) “يَدُ اللهِ مَلأَى” (আল্লাহর হাত পূর্ণ) — এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:এই হাদিস সম্পর্কে ইমামগণ বলেছেন—আমরা এর ওপর ঈমান আনি, যেভাবে তা এসেছে; এর কোনো ব্যাখ্যা করা হবে না এবং কোনো চিন্তাফিকিরো করা হবে না।

এ কথা একাধিক ইমাম থেকে বর্ণিত হয়েছে; তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবন আনাস, ইবনে উয়াইনা এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)।তাঁরা বলেছেন—এ ধরনের বর্ণনাগুলো বর্ণনা করা হবে, তাতে ঈমান আনা হবে; কিন্তু “কীভাবে(কাইফ)” বলা যাবে না।আর অন্য এক স্থানে তিনি বলেন:এই সিফাতগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবেই গ্রহণ করা তাশবীহ নয়।

বরং তাশবীহ তখনই হয়, যখন বলা হয়–
“আল্লাহর শোনা মানুষের শোনার মতো” কিংবা “আল্লাহর দেখা মানুষের দেখার মতো।, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা,১/১২৩
আর আমরা জানি আল্লাহর শুনা মানুষের শুনার মতো নয়, কারণ মানুষ শুনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ওয়ালা কান দিয়ে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা শুনেন,তবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ওয়ালা কান বা কোন আকৃতি বিশিষ্ট ঘটন ছাড়া,যা শাহ সাহেব আকীদাতুল হাসানাতে বলেছেন, যে তিনি আল্লাহ কোন শরীর বিশিষ্ট সত্বা নয়।

শাহ সাহেবের বক্তব্যে যে, অর্থ নফি করা হয়েছে, তা দলিলগুলো দেখলেই খুব সহজে বোঝা যায়।প্রথমত অর্থ নফি করার পরই তিনি দলিলগুলো এনেছেন তাই বলা যায় এগুলো অর্থ নফিরই দলিল। অতঃপর যখন আমরা তার দলিল আর দাবি আমরা মিলিয়ে দেখি, দেখা গেলো ;দাবি দলিলে একদম মিল রয়েছে।

শাহ সাহেবের দলিল পর্যালোচনা –

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–
“সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করো, কিন্তু স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করো না।”

শাহ সাহেব দেখিয়েছেন, আল্লাহর সিফাতের অর্থ নির্ধারণ করতে গেলে মানুষ স্বভাবতই ভাবতে শুরু করে– “আল্লাহ কীভাবে এই সিফাতে গুণান্বিত?” আর এই ভাবনাই হলো শাহ সাহেবের ভাষায় স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করা, যা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। তাই শুধু ‘কাইফ’ নয়, সিফাতের অর্থ নিয়ে চিন্তাও এখানে নফি হয়ে যায়।কারণ অর্থের কারণেই স্রস্টা সম্পর্কে চিন্তা আসে।

দ্বিতীয়ত, শাহ সাহেব কুরআনের আয়াত “তোমার রবের কাছেই সব কিছুর শেষ”– এর ব্যাখ্যায় বলেন, “রব্বের ব্যাপারে কোনো চিন্তা নেই।” এর অর্থ হলো, আল্লাহর সত্তা ও সিফাতের ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা–ভাবনা একটি সীমায় এসে থেমে যাবে।আর অর্থ নির্ধারণের পরই যেহেতু চিন্তা কল্পনা জাগ্রত হয়,তাই চিন্তা কল্পনা নফি করার জন্য অর্থও নফি করতে হবে।মনে রাখতে হবে শাহ সাহেব এই দলিল অর্থ নফির পরই উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয়ত, ইমাম তিরমিযী (রহ.) স্পষ্টভাবে বলেছেন– “এই সিফাতগুলোর ওপর ঈমান আনা হবে যেমনভাবে এসেছে, কোনো তাফসির করা হবে না এবং কোনো কল্পনাও করা হবে না।” এখানে “তাফসির করা হবে না” বলেই পরিষ্কার

বোঝা যায় যে অর্থ নির্ধারণ নিষিদ্ধ। আহলে আরবগণ অর্থ বুঝাতে তাফসির শব্দটি ব্যবহার করে যেটি আমরা আলাদা আলোচনায় প্রমাণ করেছি।আর “কল্পনা করা হবে না” বলার মাধ্যমে তিনি কোনো রূপ বা ধারণা তৈরির দরজাও বন্ধ করে দিয়েছেন।এ কারণে বলা যায়, শাহ সাহেবের বক্তব্যে অর্থ নফি কোনো আলাদা দাবি নয়; বরং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হাদীস ও ইমাম তিরমিযীর স্পষ্ট বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত যে আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে অর্থ নির্ধারণে প্রবেশ না করে, যেভাবে এসেছে সেভাবেই ঈমান রাখা সালাফের পথ।

4 🟦 শাহ সাহেবের মতে সিফাতের নুসূসগুলোর অর্থ নেই অন্যদিকে শাহ সাহেব আবার নির্দেশ দিচ্ছেন, মুতাশাবিহাত বিষয়গুলো আল্লাহর নিকট তাফউইজ করতে হবে –তিনি হারামাইনের আশআরি শায়েখদের থেকে আকীদা শিখে লিখেছেন –

فتختلف حالات الحضرة المقدسة فرضا وسخط و ضحك و تبشبش و قبض و اعراض و نزول في اوقات او محال ، تردد في القضاء و لعن الاقوام وا يجاب وتحريم و نسخ ومن امثال هذه فمن شاهد هذه الحضرة وعرف اهتزازها ونشراحها وعزيميتها و كونها كل يوم في شأن صارت التشابهات عنده محكمات لم يبق بالاشكال اشكال ريبة. لم يشاهدها لم يصح

له ولم يصلح الا ان #يفوض هذه الأمور إلي الله ويؤمن بجملتها

পবিত্র হযরতুল কুদসের অবস্থাসমূহ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে—কখন সন্তুষ্টি, কখন অসন্তোষ; কখন হাসি, কখন আনন্দ; কখন হুকুম আটকে রাখা ,কখন মুখ ফিরিয়ে নেওয়া; কখন নির্দিষ্ট সময়ে বা বিশেষ অবস্থায় অবতরণ; কখন ফয়সালার ব্যাপারে স্থগিততা; কখন কিছু জাতির উপর লানত, কখন কোনো বিষয়কে আবশ্যক করা, কখন হারাম ঘোষণা করা, আবার কখন কোনো বিধান রহিত করা—এ রকম আরও বহু অবস্থা রয়েছে।অতএব, যে ব্যক্তি এই দরবারের বাস্তব দর্শন লাভ করেছে, এবং এর কাঁপন, প্রশান্তি ও প্রসারতা,এবং দৃঢ়তা উপলব্ধি করেছে, আর বুঝেছে যে তিনি প্রতিদিনই নতুন এক অবস্থায় ও নতুন এক কাজে রয়েছেন—তার নিকট তখন সব ‘মুতাশাবিহ’ বিষয়ই ‘মুহকাম’ হয়ে যায়।তার কাছে আর কোনো সন্দেহজনক জটিলতা অবশিষ্ট থাকে না।যে ব্যক্তি এসব অবস্থার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পায়নি, তার পক্ষে এগুলোর সঠিক উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তার জন্য একমাত্র সঠিক ও নিরাপদ পথ হলো—এই বিষয়গুলো আল্লাহর নিকট সোপর্দ(#তাফউইজ) করা এবং সবকিছুর প্রতি সামগ্রিকভাবে ঈমান আনা।ফুয়ূজুল হারামাইন, পৃ.৫৪

5 🟦 শাহ সাহেবের মতে মুতাশাবিহাত বিষয়ে কাইফিয়্যাত নফি করতে হবে—অর্থাৎ “কেমন” তা নির্ধারণ না করে বিলা-কাইফ ঈমান রাখতে হবে।আনফাসুল আরেফিন গ্রন্থে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.),তাঁর হারামাইন থেকে ইজাজতপ্রাপ্ত শায়েখদের
জীবনী,পিতারওঅন্যান্য,আওলিয়াদের ,কাশফ-কারামত উল্লেখ করেছেন।বইটির বিশেষত্ব হলো:কোথাও পিতা বা শায়েখদের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত হলে সম্মানের সাথে স্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছেন।উদাহরণ ১:পিতার বক্তব্য: দুনিয়াতে আওলিয়াদের রূহ বিচরণ করে।শাহ সাহেবের মত: এটি আহলে সুন্নাহর ইজমার বিরুদ্ধে, তাই এটি বাতিল আকিদা।উদাহরণ ২:এক মাশায়েখের নবিজীর মহব্বত বুঝাতে একটি ঘটনা লিখেন, শায়েখ বলেছেন তুমি মদীনা শরীফে সূরা লাহাব পড়ছো অথচ এই সূরাতে রাসূলের চাচার নাম ইহানতের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার বাণী সত্য আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে তার রাসূলকে সম্বোধন করবেন কিন্তু আমাদের সেই অধিকার নেই।শাহ সাহেব এই অবাস্তব যুক্তির খণ্ডন করে লিখেছেন –যদিও এ ধরনের কথা সাইয়্যিদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি গভীর ভালোবাসার ফল এবং এটি পরহেজগার স্তর, কিন্তু আমাদের জন্য মাপকাঠি হলো সাহাবা ও তাবেয়িনদের কর্মপদ্ধতি। তিনি

বিষয়টি কেন এভাবে বোঝেন নি, যে এই সূরায় তো হযরত নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা ও মর্যাদার দিকই প্রকাশ পেয়েছে? কারণ এই সূরায় আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মর্যাদায় অবমাননাকারী তাঁর এক শত্রুর উপর অভিশাপ নাযিল করেছেন-আনফাসুল আরেফিন, পৃ.৪৮৫

এই কিতাবেই শাহ সাহেব আল্লাহর জন্য কাইফ নফি করেছেন, তিনি তার পিতার বক্তব্য উল্লেখ কাইফ নফি করেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই এই বক্তব্যকে খণ্ডন করেননি, যেটি মুলত এই কিতাবের বৈশিষ্ট্য, কোন বিষয়ে দ্বিমত হলেই শাহ সাহেব নগদেই খণ্ডন চালান। বুঝা যাচ্ছে এটিই শাহ সাহেবের মাজহাব, তিনি আনফাসুল আরেফিনে লিখেছেন;যে,মুতাযিলা ও শিয়ারা মনে করে আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব নয়। কারণ তাদের ধারণা, দেখা মানেই দিক (জিহত) বা অবস্থান লাগবে। আর তারা বলে, পূর্ণভাবে প্রকাশ বা উপলব্ধি (ইনকিশাফ) তখনই হয়, যখন সব পর্দা (হিজাব) উঠে যায়।অন্যদিকে আহলে সুন্নাত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলাকে কোনো ধরন (কাইফিয়ত) ও কোনো দিক (জিহত) ছাড়াই দেখা সম্ভব, এবং এই দেখাকেই তারা প্রকৃত ইনকিশাফ বলে মানে।

এরপর লিখেছেন;আল্লাহ তাআলার দর্শনের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আহলুল্লাহগন দুনিয়াতেই সেই জিনিস লাভ করেন, যা অন্যরা কিয়ামতের দিনে লাভ করবে। তারা এই দুনিয়াতেই আল্লাহ তাআলাকে স্পষ্টভাবে, এবং সব রকম আকৃতি, রূপ ও সীমাবদ্ধতা(হদ্দ) থেকে মুক্ত অবস্থায় দেখেন—ঠিক যেমন কিয়ামতের দিনে সাধারণ মানুষ আল্লাহকে দেখবে।আনফাসুল আরেফিন ফার্সি,পৃ.১০১

তিনি,একই কিতাবে আরেকটু সামনে গিয়ে,ইমাম আবদুল আহাদ ইবনে খাজিনুর রহমত ইবনে-মুজাদ্দিদে আলফে সানী,সারহিন্দীর বক্তব্য এনে কাইফ নফি করে লিখেছেন—

قولكم هذا نؤمن بها ولا نشغل بكيفيتها مثل الرؤية الاخرية صريح في كيفيت الرؤية قلنابل صرح بعدم الكيفية فان منع الا شغال بالكيفية كناية عن انتفاء الكيفيه وكثيرا ما يقع مثل هذا التسامح في العبارات والسياق والسباق شاهد دليل للمدعي قال بعض الكبراء في حق ذاته تعالى انه مجهول الكيفية اى لا كيفية لها

পরকালের রু'ইয়াতের উপর আমরা ঈমান রাখি, কিন্তু তার 'কাইফ' নিয়ে আলোচনা করি না—তোমাদের এই বক্তব্যে রু'ইয়াতের কাইফিয়াতটি একদম স্পষ্ট।আমরা বলি: কাইফিয়াত না থাকার বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর 'কাইফিয়্যাত নিয়ে আলোচনা না করা'—এ কথাটি মূলত

কাইফিয়্যতের অস্তিত্বই নেই—এ কথার ইঙ্গিতমাত্র। এবারতে এমন শিথিলতা প্রায়ই দেখা যায়।এবারতের সিয়াক সাবাকো কাইফিয়্যাত না থাকারই দলিল।বড় বড় আলেমদের কেউ কেউ আল্লাহ তাআলার সত্তা সম্পর্কে বলেছেন: তিনি 'মজহুলুল কাইফিয়্যাহ'—অর্থাৎ তাঁর কোনো কাইফিয়াত-ই নেই।আনফাসুল আরেফিন,ফার্সি,পৃ.১৩৮

সবচেয়ে আনন্দের বিষয়,তিনি হুজ্জাতুল্লাহর মধ্যেই আল্লাহর দেহগত কাইফিয়্যত অস্বীকার করেছেন, তিনি লিখেছেন,
وَكَذَلِكَ يَجْعَل التَّأْثِير وَالتَّدْبِير والتسخير. أي لفظ قلت على دَرَجَتَيْن: بِمَعْنى المُبَاشرَة وَاسْتِعْمَال الجَوَارِح والقوى والاستعانة بِالكيفيات المزاجية كالحرارة والبرودة وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا يجد نَفسه مستعد لَهُ اسْتِعْدَادًا قَرِيبا أَو بَعِيدا، وَبِمَعْنى التكوين من غير كيفيه جسمانية وَلَا مُبَاشرَة شَيْء وَهُوَ قَوْله تَعَالَى:{إِنَّمَا أمره إِذا أَرَادَ شَيْئا أَن يَقُول لَهُ كن فَيكون}

এভাবেই আল্লাহ' প্রভাব,পরিচালনা এবং তাখসীর স্হীর করেন। তুমি যাই বলো তা দুই ধরনের – হয়তো: সরাসরি স্পর্শ করে —অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে ,অথবা শক্তি প্রয়োগ করে,অথবা মেজাজগত গুণাবলির সাহায্যে যেমন গরম বা ঠান্ডার অনুভূতির সাহায্যে কোনো কাজ করা, যার জন্য মানুষ নিজেকে কখনো কাছাকাছিভাবে,কখনো

দূরবর্তীভাবে প্রস্তুত অনুভব করে।

(কোন কিছু তৈরি করতে মানুষের এগুলোর প্রয়োজন হয়)

দ্বিতীয়ত: কোনো শারীরিক কাইফিয়্যত ছাড়া,সরাসরি কোন জিনিস স্পর্শ ছাড়া সৃষ্টি হওয়া।এটি আল্লাহর সৃষ্টি করার সিস্টেম, যেমন তিনি বলেন:“যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, শুধু বলেন—‘হও’, আর তা হয়ে যায়।হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা,১/১১৭

এখানে দেখা যাচ্ছে শাহ সাহেব মানুষের জন্য দেহগত কাইফিয়্যত ইছবাত করেছেন,আর আল্লাহর জন্য দেহগত কাইফিয়্যত অস্বীকার করেছেন।

6 🟦তা'উইল,শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ গুটিকয়েক জায়গায় তা'উইলের বিরোধিতা করেছেন, আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তার থেকেও বেশি, তিনি তাউ'ইল করেছেন–শাহ সাহেব তা'উইলের বিরোধিতা করে লিখেছেন –

قال الحَافِظ ابْن حجر: لم ينْقل عَن النّبِي صَلَّى اللّٰه ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَن أحد من الصّحَابَة من طَرِيق صَحِيح التّصْرِيح بِوُجُوب تأْوِيل شَيْء من ذَلِك يعْنى المتشابهات وَلَا الْمَنْع من

[ذكره الدهلوي، شاه ولي الله, حجة الله البالغة, 123/1]
আল ফাওযুল কাবীরের এক স্থানেও তা'উইলের বিপক্ষে লিখেছেন।এই দুটি জায়গা ছাড়া এমন আর কোন বক্তব্য নেই যেখানে তিনি তা'উইলের বিরোধিতা করেছেন। সাঈদ আহমদ পালনপূরী রহ. রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়াতে লিখেছেন – শাহ সাহেব তা'উইলের বিরোধিতা করেছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই অনেক জায়গায় তা'উইল করেছেন।আমরা সেই জায়গাগুলো তুলে ধরবো যেখানে তিনি তা'উইল করেছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তা'উইলের বিরোধিতা করতে তিনি যেই এবারত উল্লেখ করেছেন সেটি একজন আশআরি তথা ইবনে হাজার আসকালানীর বক্তব্য। তিনি চাইলেইতো এ বিষয়ে ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য তুলে ধরতে পারতেন,কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো একটি বারের জন্যেও তিনি হুজ্জাতুল্লাহর মধ্যে ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য আনেননি।মূল সমস্যা হলো,তিনি আকীদার বক্তব্য নকল করতে আশআরি, নন-আশআরি হওয়ার বিষয়টি লক্ষ রেখেছেন সবসময়ই, আকীদার কোন আলোচনায় তিনি নন আশআরিদের বক্তব্য ব্যবহার করেননি আলহামদুলিল্লাহ।

7 ⃣ সিফাতে নুজুলের তা'উইল। শাহ সাহেব এই তা'উইলটি সেই কিতাবে করেছেন যেই কিতাবে তিনি তা'উইলের বিপক্ষে লিখেছেন,অর্থাৎ হুজ্জাতুল্লাহর মধ্যেই

তিনি তা'উইল করেছেন।তাই এটি বলার কোন সুযোগ নেই যে, শাহ সাহেব তা'উইল থেকে রুজু করেছেন।শাহ সাহেব সিফাতে নুজূল বিষয়ে লিখেছেন

قَوْله صَلَّى اللّٰه ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ينزل رَبنَا تبَارك وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا " الحَدِيث قَالُوا هَذِه كِنَايَة عَن تهيؤ النُّفُوس لا ستنزال رَحْمَة اللّٰه من وَجهه هدء الأَصْوَات الشاغلة عَن الحُضُور، وصفاء القلب عَن الأشغال المشوشة، والبعد من الرِّيَاء، وَعِنْدِي أنه مَعَ ذَلِك كِنَايَة عَن شَيْء متجدد يسْتَحق أن يعبر عَنهُ بِ النزول

وقد أَشَرنَا إِلَى شَيْء من هَذَا،

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:“আমাদের রব দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন।”এই হাদিস সম্পর্কে আলেমরা বলেন, এখানে “নেমে আসা” কথাটি আসলে একটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো হয়—আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য মানুষের মন ও অন্তরকে প্রস্তুত করা; অপ্রয়োজনীয় কথা ও শব্দ থেকে দূরে থাকা; মনকে অশান্ত করা কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়া; এবং লোক দেখানো ইবাদত থেকে বাঁচা।আর আমার মতে, এসব রূপক অর্থের /তাউইলের পাশাপাশি এখানে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন একটি নতুন বিষয়ের প্রকাশ ঘটে,যার জন্য “নুযূল (নেমে আসা)” শব্দ ব্যবহার করা

হয়েছে।আর পূর্বেই আমরা এই বিষয়ে ইঙ্গিত করেছি।হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা,২/২৬

এখানে দেখা যাচ্ছে শাহ সাহেব নুজুলের তা'উইল উল্লেখ করেছেন রহমত নাজিল হওয়া দিয়ে।

শাহ সাহেব সেই তা'উইলটি করেছেন বাবু আসরারিল আওকাত অধ্যায়ে– তিনি নুজুলের হাদীস উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

وَبِالْجُمْلَةِ فَمن ضروريات الدّين أن هُنَالك أوقاتا يحدث فِيهَا شَيْء من انتشار الروحانية فِي الأ َرْض وسريان قُوّة مثالية فِيهَا، وَلَيْسَ وَقت أقرب لقبُول الطّاعَات واستجابة الدّعْوَات من تِلْكَ الْأَوْقَات، فَفِي أدنى سعي حِينَئِذٍ يتفتح بَاب عَظِيم من انقياد البهيمية للملكية، وَالْمَلأ الْأَعْلَى لَا يعْرفُونَ انتشار تِلْكَ الروحانية وسريان تِلْكَ الْقُوّة بِحِسَاب الدورات الفلكية، بل بالذوق والوجدان ، وَبِأَن ينطبع شَيْء فِي قُلُوبهم، فيعلموا أن هُنَالك قَضَاء نازلا وانتشارا للروحانية وَنَحْو ذَلِك، وَهَذَا هُوَ المعبر عَنهُ فِي الحَدِيث " بِمَنْزِلَة سلسلة على صَفْوَان."والأنبياء عَلَيْهِم السّلَام تنطبع تِلْكَ الْعُلُوم فِي قُلُوبهم من الْمَلأ الْأَعْلَى، فيدركونها بالوجدان دون حِسَاب الدورات الفلكية، ثمّ يجتهدون فِي نصب مَظَنّة لتِلْك السّاعَة، فيأمرون الْقَوْم بالمحافظة عَلَيْهَا.

সারকথা হলো– এটি দ্বীনের জরুরি বিষয়সমূহের একটি যে এমন কিছু সময় আছে, যেসব সময়ে পৃথিবীতে রূহানিয়াতের বিশেষ বিস্তার ঘটে এবং এক ধরনের (মিসালী) শক্তি প্রবাহিত হয়। ওই সময়গুলোতেই ইবাদত কবুল হওয়া ও দোয়া গ্রহণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। সে সময়ে সামান্য প্রচেষ্টাতেই পশুত্বসুলভ প্রবৃত্তি ফেরেশতাসুলভ গুণাবলীর অধীন হয়ে যায়।

মালাআল-আ'লা এই রূহানিয়াতের বিস্তার ও সেই শক্তির প্রবাহকে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক হিসাবের মাধ্যমে জানেন না; বরং তাঁরা তা অনুভব ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করেন।অর্থাৎ তাঁদের অন্তরে বিশেষ এক প্রভাব অঙ্কিত হয়,যার মাধ্যমে তাঁরা বুঝতে পারেন যে কোনো কুদরতী সিদ্ধান্ত অবতীর্ণ হচ্ছে, রূহানিয়াত ছড়িয়ে পড়ছে– ইত্যাদি। হাদীসে একে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

"যেন সাফওয়ান পাথরে জিঞ্জির পড়ার মত গুঞ্জরিত হয়।"– এই উপমার দ্বারা।

আর নবীগণ-এর অন্তরে এসব জ্ঞান মালাআল-আ'লা থেকে সরাসরি অঙ্কিত হয়ে যায়। ফলে তাঁরা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক হিসাব ছাড়াই অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সেগুলো উপলব্ধি করেন।অতঃপর তাঁরা সেই বিশেষ সময়কে নির্ধারণের চেষ্টা করেন এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পালন করার নির্দেশ দেন।

এরপর লিখেছেন –

وَقد أجمعت أذواق من شَأنهمْ التلقي من المَلأ الأعْلى على أنّهَا أربع سَاعَات قبيل طُلُوع الشّمْس وبعيد استوائها وَبعد غُرُوبهَا وَفِي نصف اللّيْل إِلى السحر، فَفِي تِلْكَ الأوْقَات وَقبلهَا بِقلِيل وَبعدهَا بِقلِيل تنْتَشِر الروحانية، وَتظهر البركة، وَلَيْسَت فِي الأ رْض مِلَة إِلَّا وَهِي تعلم أن هَذِه الأوْقَات أقرب شَيْء من قبُول الطّاعَات، لَكِن المَجُوس كاثوا قد حرفوا الدّين، فَجعلُوا يعْبدُونَ الشّمْس من دون اللّه، فسد النّبِي صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مدْخل التحريف، فَغير تِلْكَ الأوْقَات إِلَى مَا لَيْسَ بِبَعِيد مِنْهَا وَلَا مفوت لأصل الْغَرَض، وَلم يفْرض عَلَيْهِم الصّلَاة فِي نصف اللّيْل لما فِي ذَلِك من الْحَرج، وَقد صَحّ عَن النّبِي صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قَالَ: " إِن فِي اللّيْل لساعة لَا يُوَافِقهَا عبد مُسلم يسْأل اللّه تَعَالَى فِيهَا خيرا من أمر الدُّنْيَا وَالآخِرَة إِلَّا أعطَاهُ إِيل

আর যাঁদের স্বভাবই হলো মালাআল-আ'লা থেকে গ্রহণ করা– এমন সকলের অন্তর্দৃষ্টির ঐকমত এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত যে, এই বিশেষ সময়গুলো মোট চারটি:সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী সময়, সূর্যের মধ্যাকাশে স্থির হওয়ার (দুপুরের) অনেক পরে,সূর্যাস্তের পরবর্তী সময় এবং মধ্যরাত থেকে সেহরি পর্যন্ত সময়।

এই সময়গুলোতে– এবং এর সামান্য আগে ও সামান্য

পরে– রূহানিয়াত বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে, বরকত প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী নেই, যারা জানে না যে এই সময়গুলো ইবাদত কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক নিকটবর্তী।কিন্তু মাজুসরা তাদের দ্বীন বিকৃত করে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিকৃতির সেই পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। ফলে তিনি ওই সময়গুলোকেই সামান্য পরিবর্তন করে এমন সময় নির্ধারণ করেন, যা সেগুলোর খুব কাছাকাছি, অথচ মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয় না।আর মধ্যরাতে সালাত ফরজ করেননি– কারণ এতে উম্মতের জন্য কষ্ট ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হতো।এ মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন:“নিশ্চয়ই রাতে এমন একটি সময় রয়েছে, যে সময়ে কোনো মুসলিম বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করলে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করেন। হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা,১/১১৭

আমরা দেখলাম এখানে শাহ সাহেব নুজুলের তা'উইল করেছেন, রুহানিয়্যাত এবং বরকত অবতরণের মাধ্যমে।

৪ 🟦 সিফাতে নুজুলের আরেকটি তা'উইল।

শাহ সাহেব হাম'আতে লিখেছেন –

ومن التجليات ما ينزل السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر أو مثله. وتحقيقه: أن الشمس والزهرة فيها سر من أسرار الغيب. وأقوى ما يكون من هذا السر في الأرض إذا كانتا في الأوتاد الأربعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كلالإلهى

আল্লাহর কিছু বিশেষ তাজাল্লি আছে, যেই তাজাল্লীগুলো প্রতি রাতেই দুনিয়ার আকাশে নেমে আসে–বিশেষ করে যখন রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ বা তার কাছাকাছি সময় বাকি থাকে।

এর মূল কথা হলো–সূর্য ও যুহরা গ্রহ -এর মধ্যে গায়েবের কিছু রহস্য লুকানো আছে। এই রহস্যের (প্রভাব) পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালীভাবে প্রকাশ পায় তখনই, যখন সূর্য ও যুহরা চারটি মূল অবস্থানে অবস্থান করে।এই সব রহস্যের দিকেই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এই অবস্থানগুলোর মাঝে যেটি জমিনের নিচে রয়েছে,সেটির বিষয়ে শাহ সাহেব লিখেছেন,

وفي الوتد الذي تحت الأرض تنتشر الملائكة ويتشرق فيها بارقة من النور الإلهى فيقال: إن الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر .

আর যে অবস্থানটি পৃথিবীর নিচের দিকে থাকে,সেখানে ফেরেশতারা ছড়িয়ে পড়ে,
এবং সেখানে আল্লাহর নূরের একটি ঝলক প্রকাশিত হয়।এই কারণেই বলা হয়—আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন—“আছে কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী?

এখানে তা'উইলের দিক গুলো আমরা স্পষ্ট করি,
১/ শায়েখ জাকারিয়া, তাজাল্লী শব্দের অনুবাদ করেছেন, আলো ফালানো বলে।
এই হিসেবে শাহ সাহেব এই এবারত ومن التجليات ما ينزل السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر أو مثله এর অর্থ হবে আল্লাহ কিছু আলো ফালান,যেই আলোগুলো প্রতি রাতেই দুনিয়ার আকাশে নেমে আসে—বিশেষ করে যখন রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ বা তার কাছাকাছি সময় বাকি থাকে।শাহ সাহেবের এই বক্তব্যে আল্লাহ নেমে আসেন এমন কোন কথা নেই,বরং আলো পালানোর কথা আছে,যা সুস্পষ্ট তা'উইল।

২/শাহ সাহেব, إن الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر, . এটার তা'উইল করেছেন تنتشر الملائكة ويتشرق

দিয়ে, এটির অর্থ উপরে দেখে فيها بارقة من النور الإلهى নিন।

৩/নূরের ঝলক প্রকাশিত হওয়াকে তিনি নুজুল বলেছেন।

9 ⬜ শাহ ওয়ালীউল্লাহর কলমে, খালাকাল্লাহু আদামা আলা সূরতিহী, হাদিসটির তা'উইল, শাহ ওয়ালীউল্লাহ তার জগৎবিখ্যাত কিতাব,আল-খায়রুল কাসীরে লিখেছেন –

ثم اعلمن ان كل خصوصية من الاسماء تستتبع صورة بخصوصها في عالم الامكان لخصوصية بينهما واقعة عند الله تعالى كما ق ال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته فهذا صدرت الافلاك والعناصر بصور الأسماء و من النشأة الجزئية في كل عنصر عنصر وفلك فلك،

জেনে রাখো– আল্লাহ তাআলার প্রতিটি নামের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।আর সেই নামের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'আলামে ইমকান'-এ একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ পায়,আল্লাহ তাআলার কাছে নাম ও রূপের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকার কারণে।যেমন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম-কে তাঁর রূপের উপর সৃষ্টি করেছেন।'অতঃপর এই নীতির ভিত্তিতেই আকাশমণ্ডলী (আফলাক) ও মৌলিক উপাদানসমূহ (আনাসির) আল্লাহর নামসমূহের প্রভাব অনুযায়ী প্রকাশ লাভ করেছে।আল-খায়রুল কাসীর,পৃ.৪১

শাহ ওয়ালীউল্লাহর তা'উইলটি সহজে বুঝিয়ে বলি,
আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন এক রূপে সৃষ্টি করেছেন,যে রূপটি আল্লাহর কিছু নাম ও গুণের প্রভাব গ্রহণের উপযোগী।অর্থাৎ—মানুষ আল্লাহর নামসমূহের প্রভাব গ্রহণকারী আকৃতিতে সৃষ্টি। আল্লাহর আকৃতিতে নয়।

এমনিভাবে আসমান আল্লাহ তাআলার কিছু নামের প্রভাবে,সেই নামগুলোর উপযোগী এক বিশেষ আকৃতিতে সৃষ্টি হয়েছে।আল্লাহর নাম বা আল্লাহর সূরতে সৃষ্টি হয়নি।

মোটকথা হলো : মানুষ আকৃতিটি আল্লাহর নামের প্রভাবে হয়েছে,আসমান আকৃতিটিও আল্লাহর কোন নামের প্রভাবে হয়েছে। সেই প্রভাবেই মানুষ মানুষরূপে সৃষ্টি হয়েছে আকাশ আকাশ রূপে সৃষ্টি হয়েছে।শাহ সাহেবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে দ্বিতীয় আরেকটি জিনিস বুঝা যায়,তা হলো, জমীরটি আদমের দিকেই শাহ সাহেব ফিরিয়েছেন।আমার জানামতে এমন তা'উইল ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি।

লিখেছেন মাওলানা Ayeatullah Ali Ahnaf হাফিযাহুল্লাহু তাআলা

শাহ ওয়ালিউল্লাহর আকীদা বনাম সালাফি আকীদা, তৃতীয় ও শেষ পর্ব – আলোচ্য বিষয়, ইসতাওয়া আলাল আরশ –

🔟 ফাওকুল আরশ,ইসতাওয়া আলাল আরশের তা'উইল,কিছু মানুষ নিচের বক্তব্য দিয়ে বলেন শাহ সাহেব'সালাফি আকীদার,আসুন নিচের বক্তব্যটির হাকীকত দেখি, বক্তব্য হলো এই –

أن الشّارِع لم يخاطبهم إِلَّا على ميزَان الْعقل الْمُودع فِي أصل خلقتهمْ قبل أَن يتعانوا دقائق الْحِكْمَة وَالْكَلَام وَالْأُصُول، فَأثْبت لنَفسِهِ جِهَة فَقَالَ:{الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى}.وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مرأة سَوْدَاء: " أَيْن اللَّه فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ هِيَ مُؤمنَة

الدهلوي، شاه ولي الله, حجة الله البالغة, [1/199]

প্রথম জবাব: শাহ সাহেব হুজ্জাতুল্লাহর মধ্যে লিখেছেন –

وَقوم نقصت عُقُولهمْ كأكثر الصّبيان والمعتوهين والفلاحين والأرقاء، وَكثير يزعمهم النَّاس أنهم لَا بَأْس بهم، وَإِذا نقح حَالهم عَن الرسوم بقوا لَا عقل لَهُم، فَأُولَئِك يَكْتَفِي من إِيمَانهم بِمثل مَا اكتفى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْجَارِيَة السَّوْدَاء سَأَلَهَا " أَيْن اللَّه " فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء، إِنَّمَا يُرَاد مِنْهُم أَن يتشبهوا بِالْمُسْلِمين لِئَلَّا تتفرق الْكَلِمَة.

আর এমন এক শ্রেণির মানুষ আছে, যাদের বুদ্ধি কম—যেমন অধিকাংশ শিশু, মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তি, গ্রাম্য লোক ও দাসরা। মানুষ তাদের অনেককে দেখে মনে করে যে তারা মোটামুটি ঠিকই আছে। কিন্তু তাদের অবস্থা যখন সামাজিক রীতি–রেওয়াজের থেকে আলাদা করে বিচার করা হয়, তখন দেখা যায় তাদের প্রকৃত অর্থে কোনো বুদ্ধিবিবেচনা নেই।এমন লোকদের ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুই যথেষ্ট, যতটুকু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কালো দাসী নারীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,“আল্লাহ কোথায়?”সে আকাশের দিকে ইশারা করেছিল।অতএব এদের কাছ থেকে মূলত এটুকুই চাওয়া হয়—তারা যেন মুসলমানদের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখে,যাতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হয়।
1/205], حجة الله البالغة, شاه ولي الله ،الدهلوي[

শাহ সাহেব যাদের আকল ও বোধশক্তি নেই, তাদের ঈমানের ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতাটুকুই গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন—“আল্লাহ আসমানে”।এর উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেন মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মুশরিকদের থেকে আলাদা চিহ্নিত হয়।কারণ সেই সময় মানুষের যেসব মাবুদ ছিল,সেগুলো ছিল জমিনে অবস্থিত।তাই আল্লাহ

আসমানে—এই কথাটিকে মুমিনের আলামত ধরা হয়েছে,না যে আল্লাহর জন্য প্রকৃত স্থান হিসেবে আসমান বলা হয়েছে।বিশেষত দাস-দাসী ও সাধারণ মানুষের বুদ্ধি কম হওয়ায়,তাদের থেকে এর বেশি সূক্ষ্ম কিছু জানতে চাওয়া হয়নি।

এই লেখা থেকে পরিস্কার আরেকটি জিনিস জানা যায়—যাদের বুদ্ধি ও উপলব্ধিশক্তি কম, সাধারণ মানুষ, অশিক্ষিত ও সরল প্রকৃতির লোকদের জন্য “আল্লাহ আসমানে”—এই সহজ ধারণাটুকুই যথেষ্ট ও গ্রহণযোগ্য আকীদা।তাদের ক্ষেত্রে এর বেশি গভীর বিশ্লেষণ, দার্শনিক ব্যাখ্যা বা তাত্ত্বিক তাওহীদ চাওয়া হয় না।কিন্তু যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা আছে, চিন্তাশক্তি আছে, জ্ঞান ও উপলব্ধি আছে—তাদের জন্য এই সরল ধারণাই চূড়ান্ত আকীদা নয়।তাদের ওপর দায়িত্ব হলো—আল্লাহকে স্থান, দিক, সীমানা ও সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র জেনে,তাওহীদের গভীর ও শুদ্ধ তা’উইলি/তানযীহি আকীদা পোষণ করা।এটি আমার বক্তব্য নয়, শাহ সাহেবের বক্তব্য। শাহ সাহেব আরেক বক্তব্যে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যে আল্লাহ আরশে তবে কোন দিকে বা কোন জায়গায় নয়!আশ্চর্য নয়কি,তিনি আরশে হয়েও কোন দিক বা জায়গায় নয় অথচ, আরশ একটি জায়গা এবং একটি

দিক।এর মানে হলো, আল্লাহ আরশে এটি বলা হবে বোধবুদ্ধিহীন মানুষের জন্য,আর দিকেও নয়, জায়গায়ও নয়,এটি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য। দ্বিতীয়ত, এভাবে বললে তার তাফউইজের আকীদা প্রমান হয়, তাফউইজ করলে আপনাকে প্রথমত আল্লাহ আরশে এই এবারত বিশ্বাস করতে হবে এরপর কখনো উদ্দেশ্য কখনো অর্থ তাফউইজ করতে হবে।এখানে শাহ সাহেব এবারতে বিশ্বাস করে লিখেছেন, وهو فوق العرش এরপর উদ্দেশ্য তাফউইজ করে বলেছেন, আল্লাহর তো দিকের মুহতাজ নয়,এবং জায়গারো মুহতাজ নয়, এজন্যই বলে দিয়েছেন, তিনি দিকেও নয় জায়গায়ও নয়।শাহ সাহেব লিখেছেন –

وَهُوَ فَوقَ العَرْشِ كمَا وَصَفَ نَفْسُهُ وَالكِن لا بِمَعْنَى التحيز وَالجَهَة

তিনি (আল্লাহ) আরশের উপরে আছেন—যেমন তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তা স্থান থাকা কোনো নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করার অর্থে নয়।

আল আকীদাতুল হাসানা,পৃ.৭৯

দ্বিতীয় জবাব;

শাহ সাহেব জিহতের আকীদার হাকীকত বর্ণনা করে আল বুদূরুল বাজেগাতে লিখেছেন, –

অতএব একজন মুমিন—যদিও তার আকীদা এই যে,"রহমান আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন", এবং সেই সঙ্গে তার মনে 'উর্ধ্ব দিক'-এর একটি ধারণাও আসে—এর কারণ হলো এই যে, তার উদ্দেশ্য হলো তার রবকে বস্তুজগতের সব ধরনের গুণ ও দোষ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত মনে করা। কিন্তু সে পুরোপুরি বিশুদ্ধ 'তানযীহ' (আল্লাহকে সব সাদৃশ্য ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তভাবে কল্পনা করা) ধারণা করতে সক্ষম হয় না। তাই সে বাধ্য হয়ে আল্লাহকে 'উর্ধ্ব দিক'-এর সঙ্গে কল্পনা করে এবং সেই কল্পনাকেই সে মূল বাস্তবতার স্থলাভিষিক্ত করে নেয়।

তবে বাস্তবে তার অন্তরের গভীরে তানযীহের বিশ্বাসই প্রবাহিত থাকে। আর 'উর্ধ্ব দিক'-এর এই ধারণা তার কাছে উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর উচ্চতা ও জগতের উপর তাঁর কর্তৃত্ব—এগুলো সে অন্য কোনোভাবে কল্পনা করতে পারে না বলেই বাধ্য হয়ে এই ধারণাকে তার মনে আসতে দেয়। এমন ব্যক্তির জ্ঞান যখন পরিপূর্ণ হবে এবং প্রকৃত সত্য তার সামনে প্রকাশিত হবে, তখন সে সেই সত্যকে তার পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিরোধী মনে করবে না।

(এ কারণে তার কোনো প্রকার মানসিক দ্বিধা বা অস্থিরতার সম্মুখীনও হতে হবে না।)এর বিপরীতে সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে আলেম-মুতাকাল্লিম বলে পরিচয় দেয় এবং মুশাব্বিহা (আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয় এমন

দল)-এর অন্তর্ভুক্ত—সে আলেমদের সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং নিজের ধারণায় চূড়ান্ত দলিল দিয়ে তাশবীহের আকীদা (আল্লাহকে মানুষের মতো মনে করা,কোন দিকে থাকা) প্রমাণ করতে চায়। সে এটাকেই অপরিবর্তনীয় সত্য মনে করে।এ ধরনের নামমাত্র আলেম-মুতাকাল্লিম আসলে স্তরে স্তরে জমে থাকা অজ্ঞতার ঘন অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শাহ সাহেবের এই আলোচনা থেকে যা যা আমরা আয়ত্ত করতে পেরেছি –

১. মুমিনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলাকে সব ধরনের মাদ্দি গুণ, সীমা ও সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত বিশ্বাস করা (তানযীহ)।
২. সাধারণ মানুষের পক্ষে খাঁটি ও পরিপূর্ণ তানযীহ কল্পনা করা সবসময় সম্ভব হয় না।
৩. এ কারণে আল্লাহর ‘ইস্তিওয়া আলাল আরশ’ বিশ্বাস করতে গিয়ে অনেকের মনে স্বাভাবিকভাবে ‘উর্ধ্ব দিক’-এর একটি ধারণা এসে যায়।
৪. এই ‘উর্ধ্ব দিক’-এর ধারণা আকীদার মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর মর্যাদা, উচ্চতা ও জগতের উপর তাঁর কর্তৃত্ব বোঝার একটি বাধ্যতামূলক মানসিক রূপমাত্র।

৫. মুমিন এই ধারণাকে নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে গ্রহণ করে, আল্লাহকে স্থান বা দিক দ্বারা সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়।

৬. মুমিনের অন্তরের গভীরে আসল বিশ্বাস হলো—আল্লাহ দিক, স্থান ও সৃষ্টির গুণ থেকে মুক্ত।

৭. জ্ঞান যখন পরিপূর্ণ হয় এবং প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে এই উচ্চতাসূচক ধারণা প্রকৃত আকীদার বিরোধী নয়, বরং সীমিত জ্ঞানের একটি সহায়ক ধাপ ছিল।

৮. তাই সঠিক আকীদার পথে অগ্রসর হলে এ বিষয়ে কোনো মানসিক অস্থিরতা বা আকীদাগত সংকট সৃষ্টি হয় না।

৯. তার উদ্দেশ্য তাশবিহ /দেহবাদ নয়, বরং তানযীহ ।

১০. কিন্তু মুশাব্বিহা মতের তথাকথিত আলেমরা তর্ক–বিতর্কে লিপ্ত হয়।

১১. সে তাশবিহের আকিদাকে যুক্তি দিয়ে চূড়ান্ত সত্য প্রমাণ করতে চায়।

১২. সে নিজের ধারণাকেই অপরিবর্তনীয় হক মনে করে।

১৩. বাস্তবে সে স্তরে স্তরে জমে থাকা অজ্ঞতার অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে।

এরপরে শাহ সাহেব যা লিখেছেন,আমরা যা লিখেছি,তার

চুড়ান্ত সমর্থন করে, শাহ সাহেব লিখেছেন
আমাদের এই বক্তব্যের সত্যতা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর একটি হাদিস থেকেই প্রমাণিত হয়। সেই হাদিসে তিনি বনী ইসরাইলের এক পাপী ও নাফরমান ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার পরিবারকে ওসিয়ত করেছিল–
আমি মারা গেলে আমার দেহ আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে, তারপর সেই ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেবে।
তার অন্তরে ভয় ছিল–যদি আল্লাহ তাকে আবার জীবিত করেন, তাহলে সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। সে মনে করেছিল, একমাত্র উপায় হলো তার ছাই বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে তার ছিন্নভিন্ন অংশগুলো আবার একত্র করা না যায়।
(আল্লাহ তাআলা এই ভুল আকীদা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দেন), যদিও বাস্তবে এই ধারণা সত্যের বিরোধী ছিল।

শাহ সাহেব বোঝাতে চেয়েছেন যে ঐ লোকটির আকীদা ভুল ছিল, কিন্তু তার অন্তরের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। সে আল্লাহকে ভয় করত এবং আল্লাহর প্রতি গভীর সম্মান রাখত। এই সম্মান ও ভয় থেকেই তার ভুল বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা তার ভুল আকীদা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এই ঘটনাকে শাহ সাহেব দলিল হিসেবে এনেছেন—যাতে বোঝা যায়, কেউ যদি আল্লাহকে “উপরে” থাকার বিশ্বাস করে, যদিও তা আকীদাগতভাবে ভুল, তবুও যদি উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর মর্যাদা ও মহানত্ব প্রকাশ করা, তাহলে সে ব্যক্তি ক্ষমার আশা রাখতে পারে।

এরপর শাহ সাহেব আরেকটি দলিল এনেছেন, যা লা মাজহাবিদের কোমর ভেঙে দিয়েছে —শাহ সাহেব লিখেছেন একইভাবে এক কালো দাসীর ঈমানের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর খিদমতে উপস্থিত হলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন:“আল্লাহ কোথায়?”দাসী আকাশের দিকে ইশারা করল। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:এ নারী একজন মোমিন।

শাহ সাহেবের এই দলিল থেকে কি বুঝা গেলে?বুঝা গেলো: যদিও এই আকীদা সঠিক নয় তবুও আল্লাহর পবিত্রতা মহানতা বুঝবার জন্য সহায়ক হওয়ায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি তাকে মোমিন বলেছেন। আরবি এবারব নিচে দেওয়া হলো—

فالمؤمن و ان قال : استوى على العرش، واندفع في ذلك إلى صورة الفوق، فإنها يندفع إليها اضطرارا يكون وجهة همه التنزيه

عن الفحشاء ويضيق علمه عن التنزيه الصرف فيقيم صورة التفوق على العرش مقامه، فإنها اعتماده التنزيه، وإنها التفوق تصوير له، حين ضاق مجاله، لا يقصد إليه بالذات، فإذا صفى علمه وصل إلى التحقيق، ولا يكون مناقضا لعلمه الأول، والشبه الذي بما رأى العلماء، ويثبت التشبيه بالدلائل القاطعة في زعمه ويجزم بانه هو الحق في جهل متراكم و ظلمات بعضها فوق بعض و هذا تاويل ما حكاه الصادق المصدوق من نجاة مسرف أمر اهله بحرقته و تذرية رماده حذرا من ان يبعثه اللّٰه تعالى و يقدر عليه، وما حكم به من ايمان جارية سوداء، قبل لها : ابن اللّٰه؟ فأشارت إلى السماء فكن على بصيرة من أمرك. المصرية وإذا بلغ بك التحقيق هذه المبالغ فيهما لك لا تحكم بأن معرفة العقل المعاشي بر به تفصيلا، ثم التعبير بحسب تلك المعرفة يكونان على وجوه

আল বুদূরুল বাযেগাহ, পৃ.১৩৯

তৃতীয় জবাব:

শাহ সাহেব, আল কওলুল জামিল আলা শাফায়িল আলীলে লিখেছেন –

قلْتُ إنّ لِلّهِ تعَالَى مَظَاهِرَ كثِيرَةً فَمَا مِنْ عَابد غَبِيًّا كانَ أوْ ذَكيًا إلَا وَقدْ ظَهَرَ بِحذَائِهِ صار مَعْبُودًا له ُ فِي مَنْ مرتبَتِهِ وَلِهَذَا السِّرْ

نَزَلَ الشّرع باستِقبَال القِبلَةِ وَالاستِوَاء عَلَى العَرْش وَقَالَ رَسُولُ اللّه صلى اللّه ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذا صَلَّى أحَدُكُمْ فَلَا يَبصُقُ قِبَلَ وَجْهَه فَإنّ اللّه َ تعَالَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ قَبْلَتِهِ وَسَأَلَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ فَقَالَ أَيْنَ اللّه ُ فَأَشَارَ تْ إلَى السّمَاء، فَسَالَهَا مَنْ أنَا فَأَشَارَ بِأَصْبَعِيهَا تَعْنِي اللّهَ أرْسَلَكَ فَقَالَ هِي مُؤْمِنَةٌ فَلَا عَلَيْكَ الا تَتَوَجَّهَ إلَّا إلَى اللّه ِ وَلَا تربط قَلْبَكَ إلَّا بِهِ وَلَو بِالتَّوحيه إلَى الْعَرْش وَتَصَور النُّورالّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنْ هَذَا اللَّوْن كَمِثْل لَون القَمَر أو بِالتَّوَجُّهِ إلَى الْقِبْلَةِ كمَا أشَارَ اليْهِ النّبِيٌّ صَلّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

আমি বলেছি, আল্লাহ তায়ালার অনেক প্রকাশ আছে। যে কোনো আবিদ—হোক সে বুদ্ধিহীন বা বুদ্ধিমান—তার জন্য আল্লাহর কোনো না কোনো প্রকাশ তার কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে এবং তিনি তার ইবাদতের কেন্দ্র হয়ে যান। এই কারণেই শরীয়ত কিবলা (মক্কার দিকে মুখ ফেরানো) এবং আল্লাহর আরশের উপরে দিকে মুখ ফেরানোর নির্দেশ করেছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাজ পড়ে, সে তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে, কারণ আল্লাহ তায়ালা তার এবং কিবলার মধ্যে উপস্থিত আছেন।” একবার তিনি একটি কালো দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, “আল্লাহ কোথায়?” সে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল।

তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমি কে?” সে তার আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করল, অর্থাৎ “আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন”।
রাসুল (সা.) বললেন, “সে মোমিনা,তাই ; তোমার মন কেবল আল্লাহর দিকে হওয়া উচিত এবং কেবল আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। এমনকি তুমি আরশ বা আলোর প্রতি তাকিয়ে তার প্রতি মনোযোগ রাখতে পারো, যে আলো তিনি আরশে রেখেছেন। অথবা কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে পারো,যেমন রাসুল (সা.) ইঙ্গিত করেছিলেন।আল কওলুল জামিল,পৃ.৮১

এই আলোচনা থেকে কি বুঝলাম আমরা,শরীয়ত আল্লাহর জন্য বিভিন্ন অবস্থান বর্ণনা করেছেন, শাহ সাহেব সবগুলো অবস্থানের দিকেই মনোযোগী হতে বলেছেন, আরশের ব্যাপারে বলেছেন, সেখানে আলো রেখেছেন আল্লাহ ’সেই আলোর দিকে মনোযোগি হতে বলেছেন।এরপরো কি বলবেন, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি আরশে রয়েছেন?!

শাহ সাহেবের চুড়ান্ত বিশ্বাস, আল্লাহ তায়ালা কোন দিকে নেই,
তিনি আকীদাতুল হাসানাতে লিখেছেন,
وَهُوَ فَوقَ العَرْشِ كمَا وَصَفَ نَفْسُهُ وَالكِن لا بِمَعْنَى التحيز

وَالجَهَة
তিনি (আল্লাহ) আরশের উপরে আছেন—যেমন তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তা স্থান থাকা কোনো নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করার অর্থে নয়।
আল আকীদাতুল হাসানা,পৃ.৭৯

তিনি আনফাসুল আরেফিনে দিক নফি করে লিখেছেন—আহলে সুন্নাত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলাকে কোনো ধরন (কাইফিয়ত) ও কোনো দিক (জিহত) ছাড়াই দেখা সম্ভব, এবং এই দেখাকেই তারা প্রকৃত ইনকিশাফ বলে মানে।

তিনি আল কওলুল জামিলে দিক, জায়গা নফি করে তাফউইফ করে লিখেছেন,
وهو متصف بجميع صفات الكمَال مِنَ الحَيَوة وَالعِلمِ وَالقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ وَغَيْرِهَا مِمّا وَصَفَ اللّٰه ُ بِهِ نَفْسَهُ وَثَبَتَ بِهِ النَّقلُ عن المخبر الصادق عَلَيْهِ الصَّلوٰة وَالسَّلَامُ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - مُنَزّةٍ مِّنْ جَمِيعِ سَمَاتِ النَّقص وَ الزوَال مِنَ الجِسمِيّة والتَّحَيز وَ العَرْضِيّةِ وَالجُهَةِ وَالأَلوَانِ وَالأَشْكال - وَأمّا مَا وردَر مِنَ الإِسْتوَاء عَلَى العَرْش وَالضحُك وَ اثبَاتِ اليَدَيْن فنُؤْمِنُ بِهِ عَلَى الجُمْلَةِ ثمّ نكِل تفصِيلَهُ إِلَى اللّهِ تعَالَى وَ نعلم البَتّة أنّهُ لَيسَ كمِثْل شيئ اتِّصَائِنَا بِالتّعحيز وَ غَيْرِهِ بَلْ لَيسَ كمِثْلِهِ شَيْئ و هُوَ

السّمِيعُ البَصِيرُه

তিনি সকল পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত, যেমন জীবিত থাকা, জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা ইত্যাদি গুণ যা আল্লাহ নিজেকে বর্ণনা করেছেন, এবং যেগুলো সত্যবাদী নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবা এবং তাবেঈনদের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।আল্লাহ সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত—তিনি কোনো দেহাত্মক সীমাবদ্ধতা, পরিবর্তন, দিক, রঙ বা আকারে আবদ্ধ নন।যে বিষয়গুলো কুরআন ও হাদিসে এসেছে—যেমন আরশের ওপর প্রতিষ্ঠা, হাসি, হাতের অস্তিত্ব—আমরা তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা আল্লাহর ওপর তাফউইজ করে দিই। আমরা জানি, আল্লাহ আমাদের মতো কোনো জায়গায় নেই; তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদর্শী।

আল কওলুল জামিল, পৃ.৪৩

তিনি কওলুল জামিলের আরেক জায়গায় লিখেছেন —

فَلْيَتَلَفظُ السّالِكَ اللّٰه حَاضري اللّٰه ناظرى اللّٰه مَعِي أَوْ يَتَخَيّلُ فِي الْجَنانِ ثمّ يَتَصَوّرُ حُضُورَهُ تعَالَى وَنَظْرَهُ وَمَعِيتَهُ تصُورًا جَيْدًا مُسْتَقِيماً مَعَ تَنْزِيِيه عن الْجِهَةِ والمكان حتى يَسْتَغْرِقَ في هذا

সাধক যেন বলেন—‘আল্লাহু হাযিরি আল্লাহু নাযিরি,আল্লাহু মায়ি’—অথবা নিজ মনে জান্নাতে কল্পনা করে এবং তারপর

আল্লাহর উপস্থিতি, তাঁর দৃষ্টি এবং তার মাইয়্যত সঠিকভাবে ধারণ করে, সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের দিক এবং স্থান থেকে আল্লাহকে মুক্ত ভাবে,যতক্ষণ না সাধক এতে পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে যান।

আল কওলুল জামিল, পৃ.৬৭

11/ সিফাতে ওজহুন এর তা'উইল ’শাহ সাহেবের কলমে –

، كُلّ مَنْ عَلَيْهَا كان وَيَبْقَى وجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَ الإ ِكْرَامِ
وَصِفَتُهُ . يتصوّرَ نَفْسَهُ قُدُمَاتَ وَ صارَ رَمَادا تَذَرُوهُ الريح وَ
السّمَاءُ قَدْ انشقَتْ وَكُلّ شيء قَدْ بَطَلَ تركِيبُهُ وهيئتُهُ وَيَتَصَوّرَ
الله باقِيًا مَوْجُودًا فَيَبْقَى عَلَى هذَا التّصَورِ مَليًا فَإِنّه يُفيدُ المحو

পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে,সবই ধ্বংশশীল; কিন্তু আপনার প্রতিপালক, যিনি মহিমাময় ও সম্মানিত, তিনি চিরস্থায়ী।তখন সে নিজেকে কল্পনা করে যে সে ধূলিতে পরিণত হয়ে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে, আকাশ ফেটে গেছে, সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত, তার আকার ও অবস্থান বিলীন। তখন সে কল্পনা করে যে আল্লাহ এখনও বিদ্যমান ও অবিনশ্বর। এই কল্পনাটি ধরে রাখলে এটি ফানার অর্থ প্রকাশ করে।
আল কওলুল জামিল, পৃ.৬৯

শাহ সাহেব, আল কওলুল জামীলে, আল আকায়ীদুল উজদিয়্যাহ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন,যেটি একটি আশআরি আকীদার কিতাব, তিনি লিখেছেন –